Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আমাতুল্লাহ রহিমা কোকিলা

রোলঃ 23100120634

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আমাতুল্লাহ রহিমা কোকিলা

রোলঃ 23100120634

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সীরাহ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাতুল্লাহ রহিমা কোকিলা , আইডিঃ 23100120634 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সীরাহ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Amatullah

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আমাতুল্লাহ রহিমা কোকিলা

আইডিঃ 23100120634

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা 6

ইতিহাস কি ও তাঁর উপকারিতাসমূহ 10

সীরাহ কি ও তার প্রয়োজনীয়তা 13

রাসূল ﷺ এর জন্ম, শৈশব ও কৈশোর 17

রাসূল ﷺ এর বৈবাহিক জীবনের সূত্রপাত 23

পৃথিবীতে নবুওয়াতের আলো 26

ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ 29

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার 33

দাওয়াত বন্ধের পদক্ষেপসমূহ 35

হিজরত 40

বড় বড় সাহাবাগণের ইসলাম গ্রহণ 48

শোকের বছর 53

তায়েফ যাত্রা ও অবর্ণনীয় কষ্টের মুখোমুখি 55

ইসরা ও মিরাজের ঘটনাবলী 58

আকাবার বাইআত সমূহ 62

মদিনায় হিজরতের পটভূমি 65

মদিনার পথে যাত্রা 71

নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব 75

জিহাদ ফরজ হওয়ার ধাপসমূহ 77

বদর যুদ্ধের পূর্ববর্তী সারিয়া এবং গাজওয়া সমূহ 80

ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধের পটভূমি 82

বনু কাইনুকা অভিযান 92

উহুদ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট 96

বদর দ্বিতীয় যুদ্ধ 106
খন্দক যুদ্ধ বা গাযওয়ায়ে আহযাব..107
হুদাইবিয়া'র সন্ধি 111
ঐতিহাসিক খায়বার যুদ্ধ 114
মুতার যুদ্ধ 116
যাতুস সালাসিল অভিযান 118
মক্কা বিজয় 118
হুনাইন যুদ্ধ 122
তায়েফের যুদ্ধ 123
তাবুক যুদ্ধ 124
বিদায় হজ 126
রাসূলে কারীম ﷺ এর বিদায় 130
রাসূল ﷺ এর পরিবার 137
সহায়ক গ্রন্থসমূহ 140

ভুমিকা

نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর এবং তাঁর বংশধর/পরিবারের উপর রহমত (সালাত) প্রেরণ করুন, যেভাবে আপনি ইব্রাহিম (আ.)-এর উপর এবং তাঁর বংশধর/পরিবারের উপর রহমত প্রেরণ করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত।হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর এবং তাঁর বংশধর/পরিবারের উপর বরকত নাযিল করুন, যেভাবে আপনি ইব্রাহিম (আ.)-এর উপর এবং তাঁর বংশধর/পরিবারের উপর বরকত নাযিল করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন,শৈশব-কৈশোর, যৌবন-বৃদ্ধকাল- জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধনী-গরীব সব শ্রেণীর মানুষের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনীর মাঝেই রয়েছে উত্তম আদর্শ কেননা রাসূল ﷺ এর জীবনীর মধ্যেই সমস্ত কিছুর শিক্ষা রয়েছে । মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا

"বস্তুত আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ-এমন ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।" (সূরা আহযাব:২১)

রাসূলুল্লাহ এর সর্বোত্তম চরিত্র সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন- وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ “আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন।”(সূরা কলাম:4)

একমাত্র রাসূলুল্লাহ এর সুমহান আদর্শের অনুসরণের মাঝেই রয়েছে দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ ও সফলতা। কেবল তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে বান্দা লাভ করতে পারে মহান রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা।

মহান রব্বুল আলামীন তার রাসূল ﷺ কে সম্বোধন করে বলেছেন-
قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“বলুন, ‘তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”(সূরা আলে ইমরান:৩১)

আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় দয়া ও অনুগ্রহ হলো,তিনি আমাদেরকে ঈমানের মতো সম্পদ দান করেছেন।আর ঈমানের একটি অন্যতম মৌলিক দাবি হলো,সকল নবির ওপর ঈমান আনা এবং বিশেষ ভাবে আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ ও তান আনীত দ্বীনের প্রতি ঈমান আনা।সুতরাং আমাদের ঈমান আমাদের নির্দেশ করে—আমরা যেন ইবাদত, সমাজ-সামাজিকতা,লেনদেন, সভ্যতা-সংস্কৃতিসহ জীবনের সকল অনুষঙ্গে নবিজির ইবাদত, জীবনাচার, আদর্শ ও আখলাকের অনুসরণ করি।অন্যথায় আমরা নিজেকে মুমিন হিসেবে দাবি করতে পারি না।কেননা যে নবির ওপর ঈমান আনার দাবি করছি,তাঁর আদর্শের অনুসরণই যদি না করি,তাহলে সেই ঈমানের কিবা মূল্য থাকে!

যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই সর্বশেষ নবী ও রাসূল।তার পরে আর কেউ নবী কিংবা রাসূল হিসেবে আগমন করবেন না।সুতরাং কিয়ামতের আগপর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের আগমন ঘটবে;প্রত্যেকের উপরই ফরয হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আনুগত্য করা।তাঁরই আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরামগনকে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন তাঁদের আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে তাঁদের উম্মতগণ নিজ নিজ জীবন পরিচালনা করতে পারেন। আল্লাহ সুবহানু তাআলা ইরশাদ করেছেন-

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ)

"আমি (প্রত্যেক) রাসুলকে শুধু এজন্যই প্রেরণ করেছি;যাতে আল্লাহর হুকুমে (দুনিয়াবাসী) তাঁর অনুসরণ করে চলে।"(সূরা নিসা:৬৪)

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তো নবী-জীবনের মধ্যেই আমাদের জন্য রেখেছেন উত্তম আদর্শ।শুধু তাই নয়, তার আনীত দ্বীন মেনে চলা আমাদের জন্য করেছেন আবশ্যক এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ সুবাহানু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا-

"আর রাসূল তোমাদেরকে যে(বিধান) দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।"(সূরা হাশর:৭)

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনের জন্য, তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য ও ভালোবাসা লাভের জন্য; সর্বোপরি জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি ও জান্নাতে যাওয়ার লক্ষে আমাদের অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে।তাঁরই দেখানো পথে দ্বীনের উপর অটল-অবিচল থাকার চেষ্টা করতে হবে কিন্তু আমরা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র জীবনচরিত না জানি; তাহলে কিভাবে তাঁর অনুসরণ করবো? কিভাবে তাঁর পথে চলবো? অতএব প্রত্যেক মুমিনেরই উপর আবশ্যক হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনচরিত সম্পর্কে ইলম অর্জন করা, তাঁর মহান আদর্শ সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য সীরাতের কিতাবাদি বেশি বেশি করে অধ্যয়ন করা। তাহলে আমরা সহজেই জানতে পারবো- দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে কেমন ছিল রাসুল সাঃ এর পবিত্র সুন্নাহ? দ্বীনকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেমন ছিল তার পথ ও পন্থা সর্বোপরি আমরা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারবো- দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন (আমীন)

নবীজি যখন দুনিয়ায় আসলেন তখন পৃথিবীর নীল আকাশ ছিল অশান্তি, অরাজকতা, বর্বরতা ও খোদাদ্রোহীতার এক ভয়াবহ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। কুফর,শিরক ও নীতিহীনতার নিমজ্জিত জাতিকে তুলে এনে তিনি এক আকাশ মানবতা, পারস্পরিক হৃদ্যতা ও আল্লাহ-প্রেমের অনাবিল ও সুখদ জীবন দান করেছিলেন। এরপর তার সাহচর্যধন্য সাহাবীরা, তাদের পরবর্তী তাবেঈ ও তাবে তাবীয়িরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ঈমানের দীপশিখা জ্বালিয়ে গেছেন যাতে পরবর্তী উম্মাহ পথভ্রষ্ট না হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর পুরো জীবন এমনই নিখুঁত পূর্ণাঙ্গ যে তার সামগ্রিকতা, পরিপূর্ণতা ও সার্বজনীনতা মানবজীবনের প্রতিটি অংশ এবং পৃথিবীর প্রতিটি প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট। আপনি দেখুন কি নেই নবী জীবনের মাঝে করে লেনদেন, পরিবার, সমাজ, নৈতিকতা, রাষ্ট্রীয় আইন বা কূটনৈতিক সমরনীতি

রাজনীতি ও সমরনীতি;এমনকি আপনার ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি আলাপ দেখবেন এই মহামানবের প্রতিটি কথা ও কর্মে পূর্ণমাত্রায় জীবন্ত।যে এই বিধান সমূহ মেনে চলবে, মনে প্রানে বিশ্বাস করবে এবং জীবনের ধাপে ধাপে অনুসরণ করবে সে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয়েই সফলকাম হবে।হযরত আয়েশা (রা.) কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

"كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللهِ الْقُرْآنَ"

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র ছিল কুরআন।"(সহীহ মুসলিম (হাদিস নং: ৭৪৬)

ইতিহাস কি ও তাঁর উপকারিতাসমূহ

ইতিহাসের সংজ্ঞা:

ইতিহাসকে আরবিতে বলা হয় تاريخ-'তারীখ'; 'তারীখ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ: সময়ের পরিচয়দান, সময়-সংক্রান্ত তথ্য প্রদান। আরবি প্রচলনে বলা হয়: أرخت الكتاب—অর্থাৎ আমি বইটি গ্রন্থনার সময়কালের বর্ণনা দিয়েছি।ইমাম আসমায়ি বলেন, বনু তামিমের লোকেরা বলে:ورخت الكتب تأريخا ; আর কায়েস গোত্রের লোকেরা বলে: أرخته تأريخا। এর দ্বারা এই শব্দটির মৌলিক আরবি হওয়া প্রমাণিত হয়।পরিভাষায় এটি এমন একটি শাস্ত্র, যেখানে বিভিন্ন গোত্র, বংশ, ভূখণ্ড ও ব্যক্তিদের ঘটনাসমূহের বিবরণী ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। অন্য ভাষায় বলা যায়, এটি এমন একটি বিষয়, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনাবলি দিনকাল নির্ধারণ করে
বিবৃত হয়।

উপকারিতা সমূহ:

ইতিহাসে নানাবিধ ঘরের প্রকার, বিস্তার ও পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা আমাদের সকলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

ইবনুল আসির রহ. বলেন,

"ইতিহাসের বহুবিদ ইহকালীন ও পরকালীন অনেক উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি আমি উল্লেখ করছি। অন্যগুলো গবেষকগণ নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী অনুধাবন করে নেবেন।"

★ইহকালিন উপকারিতা হলো,ইতিহাসের মাধ্যমে মানুষের পূর্ববর্তী লোকদের স্মৃতিচারণ করতে পারেন।ইতিহাসের উপকারী বিষয়সমূহ গ্রহণ করে ক্ষতিকর দিক সমূহ থেকে বেঁচে থাকার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন।পূর্ববর্তী লোকদের ঘটনা বলি হতে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করতে পারেন ভালো-মন্দের অভিজ্ঞতার ঝুলি অর্জন করতে পারেন। ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে।যা আমাদের

ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে মাতিয়ে রাখা যায় বিভিন্ন বৈঠক ও সমাবেশ যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উপকারী বটে।

★পরকালীন দৃষ্টিকোণ থেকে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি যখন পার্থিব ঘটনা বলি ও এর অধিবাসীদের উত্থান-পতনের ইতিহাস অনুধাবন করবে দুনিয়ার চাকচিক্য সৌন্দর্য তার মনে ছাপ ফেলতে কখনোই পারবে

না। কেননা সে আস্তে আস্তে দুনিয়াবিমুখ হয়ে পরকালের পাথেয় সংগ্রহে প্রবৃত্ত হবে। ইতিহাসের এ-উপকারী দিকটির বিবেচনা করেই কুরআনে বিভিন্ন ঘটনাবলির আলোচনা করা হয়েছে। যাতে এ মুসলিম উম্মাহের বোঝার জন্য সুবিধা হয়।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

“নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মতো অন্তর রয়েছে, অথবা যে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে।”(সূরা ক্বাফ:৩৭)

★ঐতিহাসিক হামাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

“ইসলামের ইতিহাস বিশুদ্ধতার অনন্য হওয়ার পাশাপাশি এতে আরও রয়েছে উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রণিধানযোগ্য আলেমগণের আলোচনা এবং তাদের গভীর জ্ঞানচর্চা, উপদেশবলি ও গুণাবলীর আলোচনা। এতে রয়েছে সকলের জীবনী যা তাদের অনুসরণকারীদের জন্য পাথেয় হতে পারে।”

ইতিহাসের লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য:

ইতিহাসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান কখনোই নষ্ট করেন না। আর সকল কাজের তা ভালো-মন্দ যাইহোক সেই কাজের ফলাফল নির্ধারিত হয় নিয়তের ভিত্তিতে।

ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ-কামনায় পূর্ববর্তী লোকদের ঘটনাবলি ও যুগ বিবর্তনের ইতিহাসের পাতা থেকে উপদেশ গ্রহণ করা একান্তই কাম্য। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

আর আমি রাসূলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলেছি, যদ্দ্বারা তোমার অন্তরকে করেছি মজবুত। আর এভাবেই তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে।(সূরা হুদ:১২০)

ইতিহাসের মর্যাদা ও গুরুত্ব:

হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে ইতিহাসশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ইলমে রিজালের গুরুত্বের বিবেচনায় ইমাম আলী ইবনে মাদিনী তার মূল্যবান উক্তিতে বলেন, "হাদীসের অর্থসংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করা ইলমের অর্ধেক আর তার বর্ণনাকারীগণের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করা বাকি অর্ধেক।"

আল্লামা সুলাইমান নদভী বলেন,
"পৃথিবীর সকল ইলম ও সকল ঘটনার জন্যই তার বর্ণনা ও ইতিহাসের হেফাজত প্রয়োজন। কেননা সকল মানুষের জন্য প্রতিটি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। আর অনুপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য ইতিহাসশাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত তা জানা সম্ভব নয়।"

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ মাসউদি তার ইতিহাসগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন,
"এই শাস্ত্রের মাধ্যমে জ্ঞানী-মূর্খ নির্বিশেষে সবাই উপকৃত হয়। সবাই এর স্বাদ উপলব্ধি করে। দূরস্থ ঘটনাসমূহ এর সাহায্যেই জানা যায়। আশ্চর্যজনক বিষয়াদির সংবাদও এর মাধ্যমে অর্জন করা যায়। এখানে পাওয়া যায় উন্নত চরিত্র ও আখলাক সম্পর্কিত বিষয়সমূহ। রাষ্ট্রপরিচালনার বিধি-বিধান ও রাজনবর্গের ইতিহাস এই শাস্ত্র থেকেই সংগৃহীত হয়। এই শাস্ত্রের মাধ্যমে গ্রাম-শহর, নিকট-দূরস্থ অতীত-বর্তমানের তথ্যাবলি আমাদের সামনে চলে আসে। এর ওপর নির্ভরশীল থাকে শরিয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান। ইতিহাসের জ্ঞানের মাধ্যমে বৈঠক ও সমাবেশমুখকে প্রাণবন্ত করে তোলা যায়।"

ইমাম আবুল ফারাজ ইস্পাহানি তার আগানি নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন,

“ইতিহাসের পাঠক তার প্রতিটি অনুচ্ছেদে বিপুল তথ্য-উপাত্ত পেয়ে থাকেন। আনন্দ নিতে থাকেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ও বিভিন্ন হাস্যরসের। অনুধাবন করতে থাকেন বিভিন্ন ঘটনার বাস্তবতা। জানতে পারেন বিভিন্নজনের জীবনী ও কবিতা। বিশেষত জ্ঞানলাভ করা যায় আরবদের প্রসিদ্ধ ইতিহাসসমূহ ও ঘটনাবলি। অন্ধকার-যুগের বিভিন্ন রাজনবর্গের ইতিহাস, ইসলামি খিলাফতগণের বৃত্তান্ত। জীবনাদর্শের গঠনে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন ঘটনাবলির মোকাবেলায় ইতিহাসলব্ধ শিক্ষাসমূহ থেকে উপকৃত হয়ে যায়; যেমন আমরা বর্তমান যুগে আওয়াবীন ও বহিরাগত শত্রুদের চক্রান্তের মোকাবেলায় ইসলামের প্রাচীন যুগের সফল শাসকদের ইতিহাস অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।”

হযরত সুফিয়ান সাওরি রাহ. বলেন,

“যখন হাদীস বর্ণনাকারীগণ মিথ্যার আশ্রয় নিতে শুরু করেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে ইতিহাস ব্যবহার করতে শুরু করি।”

সীরাহ কি ও তার প্রয়োজনীয়তা

সীরাহ:

سار–يسيرُ–سيرًا < سيرةٌ

সীরাহ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো পথ বা রাস্তা। আরবিতে সাইর মানে হাঁটা, কেউ যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় হেঁটে যায় তখন আরবিতে বলা হয় সাইরতু ফুলান, অর্থাৎ অমুক হাঁটছে।

সীরাহ বলতে এমন একটি পথ বুঝায় যার উপর দিয়ে একজন ব্যক্তি তার জীবনভর হেঁটে চলে। হান্স ডিকশনারিতে সীরাহর যে সব অর্থ দেওয়া হয়েছে তা হলো: আচার-ব্যবহার, চালচলন, মনোভাব, জীবনযাত্রার ধরন, সামাজিক অবস্থা, প্রতিক্রিয়া, কাজকর্মের ধরন ও জীবনী—এই সবগুলোই সীরাহ এর অন্তর্ভুক্ত।যার জীবনী পড়ছি

তার জীবন অনুসরণ করছি তার জীবনে আমরা অবিরাম হেঁটে বেড়াচ্ছি। সীরাহ বলতে শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ এর জীবনী বোঝায় না বরং তা দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির জীবনীকেই বোঝানো হয়।যেমন,সীরাতে আবু বকর(রাঃ),সীরাতে ওমর(রাঃ),সীরাতে আলী(রাঃ) অর্থাৎ মানে তাদের জীবনী।এগুলো একেকটাই সীরাহ কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ এর জীবনীর সাথে সীরাহ শব্দটি এত বেশি ব্যবহার করা হয়েছে যে, সীরাহ বলতে অধিকাংশ সময় নবীজির ﷺ জীবনীকেই বোঝানো হয়।আমি জানিই না অন্য ব্যক্তিদের জীবনীও সীরাহর অন্তর্ভুক্ত।

সীরাহ এর প্রয়োজনীয়তা:

১. আল্লাহ এর হুকুম :

আল্লাহ রব্বুল আল আমিন কুরআন এ প্রায় ৫০ টি আয়াতে রাসূল ﷺ কে আদর্শ হিসেবে মেনে নিতে বলেছেন। তিনি বলেছেন রাসূল ﷺ যা দেন আমরা তা যেন গ্রহণ করি এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা যেন আমরা বর্জন করি।

আরও বলেছেন আমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ হলে আমরা যেন আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ফিরে যাই।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“ যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।” (সূরা আল আহযাব, ৩৩:২১)

এভাবে বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে বিভিন্নভাবে এই নির্দেশটি দিয়েছেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয়। আর এটা তখনই সম্ভব যখন আমরা তার জীবনকে পরিপূর্ণরূপে জানব। তার জীবনকে অনুকরণ করতে হলে তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই সীরাহ জানতে হবে।

২.রাসূল ﷺ প্রতি ভালোবাসা:

বর্তমান সময়ের মুসলমানরা অভিনেতা-অভিনেত্রী,গায়ক,খেলোয়াড়,বড় বড় সেলিব্রিটি এদের জীবন মুগ্ধতার সাথে সবাই অনুসরণ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রাখে। কিন্তু তাদের জীবন থেকে নেয়ার মত কোন পাথেয় নেই,ভালো কোনো দিকনির্দেশনা নেই।তাদের পথ অনুসরণ করে কোন সফলতাই আসবেনা। কিন্তু সবথেকে অবাক এবং আশ্চর্যের ব্যাপার হলো রাসূলের জীবনে লুকিয়ে থাকা মনি মুক্তা সম্পর্কে আমরা একেবারেই অজ্ঞ । তার জীবন নিয়ে আমাদের আগ্রহ নেই বললেই চলে, এমনকু কখনো নিজ থেকে আগ্রহ প্রকাশ করি না যে ইতিহাসের সেই মহান মানবের জীবনী আমাদের জানা ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ।আর যার কারণে তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা,মায়াও নেই।কারণ কাউকে ভালোবাসতে গেলে তার সম্পর্কে একটু হলেও জানতে হয়,অনুভব করতে হয়। কাউকে ভালোবাসতে হলে তার জীবনকে বুঝতে হয়।

সীরাহ অধ্যয়ন করার একটি অন্যতম কারণ হলো অন্তরে রাসূল ﷺ এর প্রতি এক গভীর ভালোবাসা গড়ে তোলা। নবীজির ﷺ ভালোবাসা হলো অন্যতম ইবাদত। দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা গড়ে তোলার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি ভালোবাসা।রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই।’

৩.সর্বোত্তম আদর্শের অনুসরণ:

ইবন হাজার বলেছেন,‘কেউ যদি আখিরাতের জীবনে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে চায়, দুনিয়াবি জীবনে প্রজ্ঞা হাসিল করতে চায়, জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে চায়, এবং নিজের মাঝে প্রকৃত নৈতিকতা ও উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ দেখতে চায়, তবে সে যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ পথ অনুসরণ করে।’ মুহাম্মাদ ﷺ এর ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ও আখলাকের অধিকারী।তাঁর জীবনী অনুসরণ করলে পৃথিবীর আর কারও জীবনী অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা নেই। তাঁর মাঝেই রয়েছে যাবতীয় অসাধারণ গুণাবলির অপূর্ব সমাবেশ যা অন্য কোনো মানুষের চারিত্রিক গুণাবলিতে পাওয়া যায় না। তাই তাঁর সীরাহ অধ্যয়ন করার মাধ্যমে তাঁকে আরও বেশি করে অনুসরণ করা সম্ভব।

৪. কুরআনকে অনুধাবন:

কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো ওহী নাযিল হওয়ার সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয়। যেমন, আখিরাত সম্পর্কিত আয়াতসমূহ। পরিবেশ-পরিস্থিতি যাই থাকুক না কেন এ আয়াতগুলো সবসময় স্বতন্ত্র থাকে। আবার কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ সময়ে সংঘটিত কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তাই দেখা যায় যে কিছু আয়াত কোনো ঘটনার পূর্বে নাযিল হয়েছে অথবা ঘটনা ঘটার সময় নাযিল হয়েছে কিংবা ঘটনা ঘটার পরে নাযিল হয়েছে।সীরাহ এর মাধ্যমে এসব আয়াতের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়।

রাসূল ﷺ এর ইন্তেকালের পর কতিপয় সাহাবী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রাসূল ﷺ এর চরিত্র কেমন ছিল? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন "কুরআন ছিল তার চরিত্র"।

এই কথা থেকে বোঝা যায় রাসূল ﷺএর জীবনী ছিল কুরআনের প্রতিচ্ছবি।তার জীবন আমাদেরকে কুরআন বুঝতে সাহায্য করে। তার জীবন পড়লে আমরা জানতে পারবো সূরা আলে ইমরান এর আয়াতগুলো উহুদ যুদ্ধের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, সূরা আনফাল এর যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াত বদর যুদ্ধের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, সূরা দোহা নাযিল হয়েছে রাসূলের কাছে সাময়িক ভাবে ওহী নাযিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে। সূরা আহযাবের অধিকাংশ আয়াত নাযিল হয়েছে খন্দকের যুদ্ধ নিয়ে, নাযরান থেকে আগত একটি বড় খ্রিস্টান প্রতিনিধিদের দল ও তাদের সাথে কথোপকথনের সমর্থনে সূরা আলে ইমরানের আয়াত নাযিল হয়।এইসব সূরাহর বিস্তারিত বিবরণ বোঝা সম্ভব শুধুমাত্র সীরাহ অধ্যয়নের মাধ্যমে।

৫. হাদিস শাস্ত্র বুঝতে সাহায্য করে :

হাদিসের গ্রন্থগুলোতে রাসূলের জীবনের ছোট ছোট ঘটনা উল্লেখ করা হয়। কয়েকটি ঘটনা একসাথে করলে সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। হাদিসের শিক্ষাকে ও বিধি-বিধানকে উপলব্ধি করার জন্য তার জীবন সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। রাসূলের জীবনের সারমর্ম হাদিস শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৬.সীরাহ অধ্যয়ন একটি ইবাদাত:
সীরাহ বিনোদনের জন্য নয়, এটি একটি ইবাদাত। তাই সীরাহ অধ্যয়নের জন্য আল্লাহ তা‘আলার তরফ থেকে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। যে জমায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সীরাহ অধ্যয়ন করা হয়, সে জমায়েতে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করার জমায়েত, আল্লাহ তা‘আলাকে স্মরণ করার জমায়েত। আর যে জমায়েতে আল্লাহ তা‘আলাকে স্মরণ করা হয়, ফেরেশতারা সে জমায়েতে ঘিরে থাকেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

“বল, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা আলে ইমরান, ৩:৩১)

রাসূল ﷺ এর জন্ম, শৈশব ও কৈশোর

নবীজি ﷺ এর জন্মের তারিখ নিয়ে সীরাহবিদদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। মক্কার প্রখ্যাত বনু হাশিম বংশে আবরাহার বাহিনীর ধ্বংস হওয়ার ৫০ থেকে ৫৫ দিন ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে পর ৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদিকের সময় আবু তালিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ৯ই রবিউল আউয়াল শফিকুল রহমান মোবারক পুরী আর রাহীকুল মাখতুম উল্লেখ করেছেন। সিরাতে ইবনে হিশামের মাঝে ইবনে হিশাম রাহি: ১২ই রবিউল আউয়াল এবং ইদ্রিস কান্ধলভী রাহি: সিরাতে মুস্তফা গ্রন্থে ৮ই রবিউল আউয়াল এর কথা বলেছেন। ইবনে ইসহাক রাহি: ১২ই রবিউল আউয়াল এর কথা বলেছেন।

কায়েস ইবনে মাখরামা থেকে বর্ণিত,তিনি বলেছেন,“আমি ও রাসুলুল্লাহ ﷺ আবরাহার হামলার বছর জন্মগ্রহণ করি।তাই আমরা সমবয়সী।”

রাসূল ﷺ এর দুগ্ধপান ও শৈশব:
শিশু নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কে প্রথমে তাঁর শ্রদ্ধেয় জননী আমিনা এবং কিছুদিন পর আবূ লাহাবের দাসী সুওয়াইবাহ দুধ পান করান। অতঃপর হালীমা সা'দিয়া এ সৌভাগ্য

অর্জন করেন।আরবের সম্ভ্রান্ত গোত্রগুলোর মাঝে সাধারণত একটি নিয়ম ছিল যে, তারা নিজ শিশুদেরকে দুধ পান করানোর জন্য আশপাশের গ্রামে পাঠিয়ে দিতেন। ফলশ্রুতিতে শিশুদের শারীরিক সুস্থতার বিকাশ এবং বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিক্ষা অর্জন সহজ হতো। এজন্য বেদুঈন পরিবারের মহিলারা শিশু সংগ্রহের জন্য প্রায়ই গ্রাম থেকে শহরে আসতেন। একবার বনু সা'দ গোত্রের একদল মহিলার সঙ্গে বিবি হালীমা অর্থের বিনিময়ে দুধ পান করবে এমন শিশুর সন্ধানে মক্কায় আসেন। সাথে ছিলেন তার স্বামী ও তাঁর দুধের শিশু।

বিবি হালীমা বলেন, বছরটি দুর্ভিক্ষের বছর ছিল। দুর্ভিক্ষের কারণে আমাদের প্রায় সবকিছুই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি আমার সাদা মাদি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে চলছিলাম। আমার সঙ্গে উটও ছিলো। উটের ওলান থেকে এক ফোঁটা দুধও বের হচ্ছিলো না। আমার শিশুটির জন্য আমার বুকেও এক বিন্দু দুধ ছিলো না। ক্ষুধার তাড়নায় সে ছটফট করছিলো। তার কান্নাকাটির কারণে সারারাত আমরা ঘুমাতে পারিনি।আমার মাদি গাধাটি ছিলো খুবই দুর্বল। দুর্বলতার কারণে সে এতই ধীরে ধীরে পথ চলছিলো যে, কাফেলার অপর সাথীরা বিরক্ত হচ্ছিলো। যাই হোক, অবশেষে আমরা মক্কায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। মক্কায় আসার পরে এতিম শিশু মুহাম্মদ সাঃ কে কোন নারী গ্রহণ করছিলেন না। আরহালিমার সৌভাগ্য তার দুধের স্বল্পতার জন্য তার কাছে কোন নারী সন্তান দিচ্ছিল না।অতঃপর হালিমা তার স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এতিম শিশু মুহাম্মদ সাঃ কে গ্রহণ করে। নবীজিকে গ্রহণ করার সাথে সাথেই বরকত বৃদ্ধি পেতে থাকে। হালিমার দুধ এত বৃদ্ধি পায় যে নবিজী ও তার দুধ ভাই তৃপ্তির সাথে দুধ পান করে ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের উটনিও দুধে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।সকালে আবার স্বামী বললেন হালিমা!আল্লাহর শপথ!তুমি একজন মহাসৌভাগ্যবান সন্তান লাভ করেছো।উত্তরে আমি বললাম,আল্লাহর শপথ! আমারও তাই মনে হচ্ছে। তারা মক্কা থেকে ফেরত যাওয়ার সময় তাদের গাধাকে দেখে দলের সফর সঙ্গীরা অবাক হয়ে যায়। সেই সময় তাদের এলাকায় দুর্ভিক্ষ চলছিল। কোন পশু দুধ দিচ্ছিল না। তারা ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই সমস্ত বকরিগুলো দুধে পূর্ণ হয়ে যায়। এভাবেই তারা নবীজির বরকত উপলব্ধি করতে পারে।

রাসূল ﷺ এর পিতৃছায়া:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই তার সম্মানিত পিতা ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদিনায় সফরে যান। তিনি সেখানে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থতার জন্য ইন্তেকাল করেন। এভাবেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে তার উপর থেকে পিত্রাছায়া অপসারিত হয়ে যায়।

রাসূল ﷺ এর বংশধারা :

রাসূল ﷺ শুধু সেরা মানুষই ছিলেন না বরং তার জন্ম হয়েছিল অন্যতম সেরা বংশে।পৃথিবীর সমস্ত বংশধারা হতে অধিক সম্ভ্রান্ত ও উত্তম। এমনকি মক্কার কাফেররা যখন তার ঘরদোর শত্রুতায় লিপ্ত ছিল তখনও তারা তা অস্বীকার করতে পারেনি তিনি নিজেইবলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ ইসমাঈলের বংশধরদের মধ্য থেকে কিনানাকে পছন্দ করেছেন, কিনানার মধ্য থেকে কুরাইশদের মনোনীত করেছেন, কুরাইশদের মধ্য থেকে
বনু হাশিমকে মনোনীত করেছেন এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।”(সহীহ মুসলিম, তিরমিযী)
ভিন্ন এক হাদিসে রাসূল বলেন, “আমি বৈবাহিক সম্পর্কজাত সন্তান, আদম থেকে শুরু করে আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত আমার বংশধারায় কোন অবৈধ সন্তান নেই। জাহিলিয়াতের ব্যভিচার আমার বংশকে দূষিত করতে পারেনি।"

রাসূল ﷺ এর পৈতৃক বংশধারা:

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আব্দে মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন কা'ব বিন লুয়াই বিন গালিব বিন ফিহর বিন মালিক বিন নাযর বিন কিনানাহ বিন খুযায়মাহ বিন মুদরিকা বিন ইলিয়াস বিন মুযার বিন নাযার বিন মা'আদ বিন আদনান। এ পর্যন্ত তার বংশতালিকা নিয়ে কোনো মতভেদ নেই।তবে এরপরে বংশতালিকায় কিছুটা মতভেদ রয়েছে।
রাসূল ﷺ এর মাতৃবংশধারা:

মুহাম্মদ বিন আমিনা বিন ওয়াহাব বিন আবদে মানাফ বিন যুহরা বিন কিলাব।দেখা যাচ্ছে, কিলাব পর্যন্ত গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর পিতা ও মাতার বংশধারা একত্রিত হয়েছে।

রাসূল ﷺ এর পেশা:

রাসূল ﷺ এর জীবনের প্রথম পেশা ছিল গবাদি পশুচারণর।রাসূল ﷺ বলেন,”আল্লাহ তা’আলা এমন কোন নবীকে প্রেরণ করেননি,যাকে মেষপালক হতে হয় নি।” সাহাবীগণ তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনিও কি?তখন তিনি বললেন,হ্যাঁ!আমি মক্কা লোকদের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে মে চরাতাম এটা আশ্চর্যজনক যে,আল্লাহতালা তার সকল আম্বিয়াকে এভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

রাখাল হওয়ার মাধ্যমে আম্বিয়া আঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষাটি অর্জন করেছিলেন তা হলো, দায়িত্বশীলতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-
“জেনে রেখো!তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সহিহ মুসলিম:১৮৩৯)

বক্ষ বিদারণ:

রাসূল সাঃ এর জন্মের চতুর্থ বা পঞ্চম বছর প্রথমবার তাঁর বক্ষ বিদারণের ঘটনা ঘটে।রাসূল ﷺ ও তার দুধ ভাই আব্দুল্লাহ পশু চরাতে গেলেন। এমন সময় আব্দুল্লাহ হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ফিরে এলেন এবং বললেন আমার কুরাইশী ভাইকে দু’জন সাদা কাপড় পরিহিত লোক শুয়ে তার বুক চিরে ফেলছে। আমি তাঁদেরকে এ অবস্থায় রেখে এসেছি। আমরা ঘাবড়ে গিয়ে মাঠে দিকে দৌড়ে গেলাম। দেখতে পেলাম,তিনি বসে আছেন, কিন্তু তার চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে গেছে।জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, দুজন সাদা কাপড় পরিহিত লোক এসে আমাকে ধরে শুইয়ে দিল আমার পেটে হেরে কি যেন খুঁজে বের করল আমি জানিনা তাকেই ছিল অতঃপর আমরা তাকে ঘরে নিয়ে আসলাম ।তার মোট কয়বার বক্ষ-বিদারণ হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। ইদ্রিস কান্দলভী রা: চারবার বক্ষ-বিদারন এর বর্ণনাকে গ্রহণযোগ্য বলে মত

দিয়েছেন।বক্ষ বিদারণের সময় অধিকাংশের মতে জিবরীল আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছিলেন ভিন্ন বর্ণনামতে জিবরীল
ও মিকাইল আ: দুজনেই এসেছিলেন।অতঃপর মক্কায় এসে তাঁকে তার মায়ের নিকট সমার্পণ করলাম।তখন তাঁর মা বললেন আগ্রহের সাথে নিয়ে গিয়ে এতো শীঘ্রই ফিরিয়ে আনার কারণ কি?অনেক জিজ্ঞাসার পর সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করতে হলো।তিনি সবকিছু শুনে বললেন, অবশ্যই আমার সন্তানের এটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে

মা- দাদার মৃত্যু এবং চাচার তত্ত্বাবধানে:

নবীজি ﷺ এর যখন ছয় বছর বয়স তখন তাঁর মা আমিনা বিনতে ওয়াহাব মদিনায় যান তাঁর পিতার কবর দেখতে এবং বনু নাজ্জার গোত্রে তাঁর মামাদের সাথে সাক্ষাৎকারের জন্য। কিন্তু মদিনা থেকে ফেরার পথে তাঁর মা আমিনা বিনতে ওয়াহাব ইন্তেকাল করেন। আমিনা বিনতে ওয়াহাবকে মক্কা ও মদিনার মাঝামাঝি আবওয়া আমাকে স্থানে দাফন করা হয়।এরডর তার লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন দাদা আব্দুল মুত্তালিব। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে মুহাম্মদের প্রতি আবদুল মুত্তালিবের যত্ন ভালোবাসা বেড়ে যায় বহু গুণে।তবে সে যত্ন ভালোবাসা বেশি দিন তিনি পান নি। মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর দাদাও ইন্তেকাল করেন। দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর দায়িত্ব গ্রহণ করেন চাচা আবু তালিব। রাসূলের প্রতি তার ভালোবাসা স্নেহ মমতা ছিল অতুলনীয় কিন্তু আবু তালিব ছিলেন দরিদ্র পাশাপাশি তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল বেশি। ফলে ১২ বছর বয়সী শিশু মুহাম্মদকে জীবিকা উপার্জনের চিন্তা করতে হয় তিনি পার্বত্য উপত্যকায় আপন চাচার মেষ চরাতে চলে যেতেন আবু তালিবের পরম যত্নের ছায়ায় বেড়ে ওঠেন মুহাম্মদ সাঃ। চাচা আবু তালিবের স্নেহের ছায়ায় থাকাকালীনই তিনি 40 বছর বয়সে উপনীত হন এবং নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন।

শামের পথে, সান্নিধ্যে আসলেন বাহীরা রাহিব:

রাসূল ﷺ বারো বছর বয়সে ব্যবসায়িক সফরে চাচা আবু তালিবের সাথে তিনি একবার শামের (সিরিয়া) বসরায় যান। এ শহরে ছিলেন জারজীস নামক এক খ্রিস্টান ধর্মযাজক; যিনি বাহীরা উপাধিতে পরিচিত। মক্কার ব্যবসায়ীরা বসরায় শিবির স্থাপন করলে বাহীরা

রাহিব তাদের নিকট আসলেন; অথচ অন্য কোনো বাণিজ্য কাফেলার কাছে এভাবে কখনো তিনি আগমন করেননি। তিনি কিশোর মুহাম্মাদ ﷺ কে দেখে বুঝতে পারলেন, ইনিই হচ্ছেন বিশ্বমানবের মুক্তির দিশারি শেষ নবী (ﷺ)। তারপর তিনি তাঁর হাত ধরে বললেন, ইনি হচ্ছেন বিশ্বজাহানের সর্দার। আল্লাহ তাঁকে একদিন বিশ্বজাহানের জন্য রহমতস্বরূপ মনোনীত করবেন।

আবু তালিব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কীভাবে বুঝলেন, তিনি আখেরী নবী হবেন? তিনি বললেন, গিরিপথের প্রান্ত থেকে কাফেলার আগমন তিনি দেখছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন যে, এমন কোনো বৃক্ষ বা পাথর ছিলো না; যা তাঁকে সিজদা করেনি। তাঁর কাঁধের কষ্টি হাঁড়ের পাশে আপেল আকৃতির একটি দাগ আছে, সেটাই হচ্ছে মোহরে নবুওয়াত। আমাদের কিতাব ইনজীল থেকে আমরা এসব কিছু অবগত হয়েছি।
পুনরায় পাদ্রি বললেন, তাঁকে নিয়ে শামে ভ্রমণ করবেন না। কারণ তাঁর পরিচয় ইয়াহুদী ও রোমীয়রা জানতে পারলে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এ কথা জানার পর আবু তালিব তাঁকে কয়েকজন গোলামের সঙ্গে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

ফিজার যুদ্ধ:

রাসূল ﷺ এর জীবনে দেখা সর্বপ্রথম যুদ্ধ ছিল ফিজার যুদ্ধ। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২০বছর।এই যুদ্ধ টি হারাম মাসে সংঘটিত হয়েছিল বিধায় এই যুদ্ধ কে ফিজার যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করা হয়।এ যুদ্ধে কুরাইশ ও তাঁর মিত্রগণ এক দিকে,অন্য দিকে কাইস গোত্র এই দুই গোত্রের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। মুহাম্মদ ﷺ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত তীর কুড়িয়ে এনে কুরাইশদে ে দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

হিলফুল ফুযুল:

ফিজার যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতা সুচিন্তাশীল ও সদিচ্ছাপরায়ণ আরববাসীকে দারুণভাবে বিচলিত

করে তোলে। এ যুদ্ধে কত যে প্রাণহানি ঘটে, কত শিশু ইয়াতীম হয়, কত নারী বিধবা হয় এবং কত সম্পদ বিনষ্ট হয় তার ইয়ত্তা নেই। ভবিষ্যতে আরববাসীকে যাতে এ রকম অর্থহীন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ভয়াবহ ধ্বংসের মুখোমুখি হতে না হয় সেজন্য হিলফুল ফুযুল (শান্তি-সংঘ)নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।হিলফুল ফুযুল নবুওয়াত-পূর্ব সময়ে রাসূল ﷺ এর জীবনের আরেকটি অন্যতম ঘটনা।সভায় উপস্থিত ছিলেন কুরাইশদের প্রধান নেতৃবৃন্দ।এই শান্তি সংঘের মূল লক্ষ্য ছিল যে কোন নিপীড়তের সহযোগিতা করার জন্য।এবং নিপীড়কে প্রতিহত করা-মজলুম মক্কাবাসী হোক কিংবা মক্কার বাইরের,কারও দিকেই দৃষ্টিপাত করা হবে না। হিলফুল ফুযুল বা শান্তি সংঘের প্রতি সন্তোষজ্ঞাপন করেন। রাসূল ﷺ নবুওয়াত প্রাপ্তির পর বলতেন, যদি ইসলাম আসার পরেও আমাকে এমন কোনো সংঘের দিকে আহবান করা হতো, তাতে আমি সাড়া দিতাম।

রাসূল ﷺ এর বৈবাহিক জীবনের সূত্রপাত

ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন:

খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযি. এক সম্ভ্রান্ত সম্পদশালিনী ও ব্যবসায়ী মধ্যবয়স্ক মহিলা ছিলেন। তিনি মূলত বিধবা ছিলেন।ব্যবসায়ে অংশীদারিত্ব এবং প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী লাভাংশের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তিনি ব্যবসায়ীগণের নিকট অর্থলগ্নী করতেন।কারণ তিনি নিজ ঘরের বাহিরে গিয়ে ব্যবসা করতেন না। পুরো কুরাইশ গোত্র মূলত ব্যবসার উপরই নির্ভর করতো। খাদীজা রাযি. যখন মুহাম্মাদ ﷺ এর সত্যবাদিতা, উত্তম চরিত্র ও আমানতদারিতার ব্যাপারে অবগত হলেন, তখন তিনি তাঁর নিকট একটি প্রস্তাব পেশ করলেন। তা হলো, তিনি খাদীজা রাযি. এর অর্থ নিয়ে ব্যবসা করার জন্য তাঁর দাস মায়সারাহ’সহ শামে যেতে পারেন। তিনি আরও বললেন, অন্য ব্যবসায়ীকে যে পরিমাণ লাভ দেওয়া হয়; তাঁকে তার চেয়ে বেশি লাভ দেওয়া হবে। মুহাম্মাদ ﷺ এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। খাদীজা রাযি. এর অর্থ ও দাস মায়সারাহকে নিয়ে তিনি শামে গেলেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো পঁচিশ বছর।

খাদিজা রাযি.এর সাথে বিবাহ:

শাম থেকে ব্যবসা করে যখন রাসূল ﷺ এবং মায়সারাহ ফিরে এলেন। তখন মায়সারাহ খাদিজা রাঃ কাছে তাদের সফরের বর্ণনা দিতে এসে মুহাম্মদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।এবং ব্যবসা করে তিনি এতো বেশি অর্থ পেলেন ;যা এর আগে কখনোই পান নি। মায়সারাহ বলেন,এই মানুষটার সততা, বিশ্বস্ততা মুগ্ধ হওয়ার মতো! খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা নবীজির কথা শুনে যত শুনছেন ততই তার প্রতি আগ্রহবাধ করছেন।খাদিজা রাঃ, মক্কার একজন বৃত্তশালী মহিলা,এক সাধারণ কর্মচারীর অসাধারণ চরিত্রের মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ক্রমেই তাঁর মনে মুহাম্মাদ ﷺ কে স্বামী হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছে আর আগ্রহ উভয় প্রবল হতে লাগলো। অথচ এর আগে বড় বড় সর্দার, নেতা, গোত্রপ্রধানগণ তাঁর নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন; কিন্তু তিনি তাদের কারো প্রস্তাবই গ্রহণ করেননি। মুহাম্মাদ ﷺ কে স্বামী হিসেবে পেতে তাঁর যারপরনাই ব্যাকুলতা যেন বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। তিনি তাঁর বান্ধবী নাফীসা বিনতে মুনাব্বিহ’র সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করলেন। তাকে বললেন, তাঁর এ প্রস্তাবটি মুহাম্মাদ ﷺ কে জানানোর জন্য।

রাসূল ﷺ স্বীয় চাচা আবু তালিবকে তা জানালেন। তিনি খাদীজা রাযি. এর চাচার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলে বিবাহের ব্যাপারটি চূড়ান্ত করলেন। তারপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে দু’টি প্রাণ পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। বিবাহ অনুষ্ঠানে বনু হাশিম ও মুযারের প্রধানগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের শোভাবর্ধন করে। আবু তালিব এ পবিত্র বিবাহের খুতবা পাঠ করেন।শাম থেকে ফেরার দু’মাস পর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ ﷺ বিয়ের মোহরস্বরূপ খাদীজা রাযি. কে ২০টি উট প্রদান করেন।বিয়ের সময় নবীজি ﷺ এর বয়স ছিল পঁচিশ আর খাদিজা রাযি.এর বয়স ছিল চল্লিশ। দুজনের বয়সের পার্থক্য ছিল ১৫ বছর কিন্তু বয়সের এই সুবিশাল ফারাক তাদের বৈবাহিক জীবনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। এমনকি খাদিজা রাঃ বেঁচে থাকাকালীন তিনি আর কোনো মহিলা কে বিবাহ করেন নি।

কাবা ঘরের পুনঃনির্মান ও হাজরে আসওয়াদ সংস্থাপন

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পঁয়ত্রিশ বছরে পদার্পণ করেন, তখন কুরাইশগণ কা’বা ঘরের পুনর্নির্মাণ কাজ শুরু করেন। কাবা পুনঃনির্মাণ মুহাম্মদ ﷺ এর নবুওয়াত প্রাপ্তির আগের একটু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

কারণ তা অনেক আগে নির্মাণ করা হয়েছিলো বিধায় দেয়ালগুলোতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে যায় এবং যে কোনো সময় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিলো। তাছাড়া মক্কায় ঐ বছর বন্যা হওয়ার কারণে কা’বা অভিমুখে পানির স্রোত সৃষ্টি হয়েছিলো। এমন অবস্থায় কুরাইশগণ কা’বা পুনর্নির্মাণের জন্য সংকল্পবদ্ধ হলেন।আল-কা’বা মোট চার বা পাঁচবার পুনর্নির্মিত হয়েছে। ইবরাহীম ﷺ এবং আদম ﷺ এই দুইজনের মধ্যে কে সর্বপ্রথম আল-কা’বা নির্মাণ করেছিলেন তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতানুসারে ইবরাহীম-ই ﷺ প্রথম তা নির্মাণ করেন।

আল কাবা নির্মানের সময় তাদের বৈধ অর্থ-সম্পদগুলোই শুধু ব্যবহার করা হয়েছিলো। আল্লাহর ঘরের দেয়াল ভাঙা কারণ মনে করে ভয়ে কেউই দেয়ালে হাত লাগাচ্ছিলো না। তখন সর্বপ্রথম ভাঙার কাজে হাত দেন ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ মাখযূমী। তারপর বাকিদের ভয় কেটে গেলো তারাও তাতে হাত লাগায়। নির্মাণ কাজে প্রত্যেক গোত্র যেন অংশ নিতে পারে, সেজন্য পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছিলো— কে কোন অংশ নির্মাণ করবে? বাকুম নামক এক রোমীয় মিস্ত্রির তত্ত্বাবধানে নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছিলো; কিন্তু হাজারে আসওয়াদের স্থান পর্যন্ত গিয়ে কাজ থেমে যায়। ব্যাপারটি হলো, কে হাজারে আসওয়াদ স্থাপন করে মহাগৌরব অর্জন করবে? চার-পাঁচ দিন এ নিয়ে বাগড়া চলছিলো। সবাই নিজ নিজ দাবিতে অনড়। তাদের জিদ ধীরে ধীরে রেখারেখি পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। এ ব্যাপারে তারা কিন্তু খুনাখুনি করতেও পিছপা হবে না, সকল গোত্রে যুদ্ধের জন্য সাজ সাজ রব; এমনই এক অবস্থা তখন বিরাজ করছিলো।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য তো মাসজিদুল হারামের দরজা দিয়ে যে সবার প্রথম প্রবেশ করবে তিনি এর ফয়সালা করবেন।আল্লাহর ইচ্ছায় মহানবী সর্বপ্রথম ওই দরজা দিয়ে মাসজিদে প্রবেশ করেন এবং তাকে দেখে সবাই এক বাক্যে বলে ওঠে ইনি তো আল-আমীন, আমরা তার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকবো। নবীজি তার বিজ্ঞ জ্ঞান থেকে

ফয়সালা করেন যে চাদর বিছিয়ে সেটাতে হাযরে আসওয়াদ রাখবেন। প্রত্যেক গোত্রের নির্ধারিত ব্যক্তিকে চাদরের এক একটি প্রান্ত ধরতে বলেন। সবাই এভাবে ধরার পর পাথরটিকে কাবা ঘরে নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তিনি নিজ হাত উঠিয়ে সেটিকে স্থাপন করেন।

পৃথিবীতে নবুওয়াতের আলো

হেরা গুহায় ধ্যানমগ্নতায়:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়তের প্রাপ্তির সময় যতই ঘনিয়ে আসছিল ততই তিনি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগলেন, জাহেলি সমাজের বর্ধর প্রথা ও সংস্কৃতি থেকে মানুষকে বের করে নিয়ে আসার এক অদম্য অভিপ্রায় তার হৃদয়ে গ্রাস করে ফেলল।তখন তাঁর দ্বীনের জন্য বিচার-বিবেচনা ও চিন্তা-ভাবনা জনগণ ও তাঁর মাঝে এক ধরনের প্রাচীর তৈরি করে দেয়।বাস্তবিক অর্থেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হলেন তখন খাবার ও পানি নিয়ে তিনি মক্কা হতে দু'মাইল দূরে জাবালে নূরের গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতেন।পুরো রমজান মাস তিনি হেরা গুহায় অবস্থান করে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে ধ্যান-মগ্ন থাকতেন। মশগুল থাকতেন বিশ্বপরিচালক মহান সত্তার ধ্যানে। স্বগোত্রীয়দের অন্ধীন বিশ্বাস ও পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণা তাঁকে খুবই পীড়া দিতো। কিন্তু তখন তাঁর সামনে এমন কোনো পথ ছিলো না, যে পথে তিনি শান্তি ও স্বস্তির সন্ধান পাবেন।পুরো রমাদান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় অবস্থান করেন এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইবাদতে ব্যস্ত থাকেন। নবুওয়াতের সময় যদিও আসছিল। ওহীর আগমনের পূর্ব থেকেই সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ নবীগণকে নবুওয়াতের জন্য প্রস্তুত করে থাকেন। হাদিসের মধ্যে এসেছে- "সত্য স্বপ্ন নবুওয়াতের ৪৬ ভাগের ১ ভাগ"।

আয়িশা বলেন, "আল্লাহর রাসূল এর প্রতি সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহীর সূচনা হয়। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন, তা প্রভাতের রশ্মির মতোই স্পষ্ট প্রতিভাত হত"। (বুখারী ও মুসলিম)

এছাড়াও ইবনে ইসহাক বলেন, ওয়াহাব ইবনে কায়সান আমাকে জানিয়েছেন, তাকে উবাদ বলেছেন, “প্রতি বছর সেই মাসটিতে (রমজান) রাসূলুল্লাহ নির্জনে অবস্থান করতেন। সেসময় তাঁর কাছে যেসব গরীব লোক আসত, তিনি তাদের খাওয়াতেন। মাসটি অতিক্রান্ত হলে তিনি নির্জনবাস পরিত্যাগ করে বাড়িতে ফেরার আগে প্রথমে সাতবার বা আল্লাহ যতবার চাইতেন ততবার কাবা শরীফ তাওয়াফ করতেন। তারপর নিজের বাড়িতে ফিরে যেতেন।”

নবুওয়াতপ্রাপ্তি:

রাসূল নবুয়্যাত লাভের ৩ বছর আগে থেকে প্রতি রমযানে হেরা গুহায় অবস্থান করতে শুরু করেন। এভাবে তৃতীয় বছরে হেরা গুহায় অবস্থানকালে এক রাতে জিবরীল আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নিয়ে আসেন এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়্যাত ও রিসালাত লাভ করে ধন্য হন।

জিবরীল আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করে রাসূল কে বললেন, “তুমি পড়ো”। তিনি বললেন, “আমি পড়তে জানি না”। তখন জিবরীল তাঁকে অত্যন্ত শক্তভাবে ধরে আলিঙ্গন করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, “তুমি পড়ো”। তিনি আবারও বললেন, “আমি পড়তে জানি না”। এরপর পুনরায় তাঁকে আলিঙ্গন করার পর ছেড়ে দিয়ে বললেন, “পড়ো, সেই প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে...” এভাবে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত তেলাওয়াত করে শোনালেন এবং চলে গেলেন। এই ঘটনার পর রাসূল অস্থির চিত্তে ঘরে ফিরে আসলেন এবং স্ত্রী খাদিজার কাছে সবকিছু খুলে বললেন।

সবকিছু শুনে খাদিজা তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, “আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমান করবেন না, কেননা আপনি-যজ্ঞানদের সাথে আপনি সম্পর্ক রক্ষা করেন, অভাবগ্রস্তদের আহার মোচনের চেষ্টা করেন, অসহায়দের আশ্রয় দান করে মেহমানদের আদর-যত্ন করেন, অতিথিদের অতিথেয়তা প্রদান করেন এবং খণ্ডগ্রস্তদের দায় মোচনে সাহায্য

করেন, যারা সত্যের পথে থাকে তাদেরকে আপনি সাহায্য করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে অপমান করবেন না।”
ইবনু হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ এই বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি হলেন খাদিজা রা.।

ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের ভাষ্য:

এরপর খাদিজা রা. রাসূল সা. কে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল এর কাছে নিয়ে গেলেন।ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল আরবতত্ত্ব ও ইঞ্জিলের উপরে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন এবং ঈসা আ. আনীত ধর্ম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান রাখতেন। খাদিজা রা. তাঁকে তিনি সবকিছু খুলে বললেন। সবকিছু শুনে তিনি বললেন, “ভাতিজা, বলতো তুমি কী দেখেছ? কী হয়েছে তোমার?” তখন রাসূলুল্লাহ সা. হেরা গুহায় তাঁর সাথে যা ঘটেছিল তার সম্পূর্ণ বিবরণ খুলে বললেন। এসব কিছু শোনার পর তিনি বললেন, “এটিই সেই নামুস (বার্তাবাহক) যিনি আগমন করেছিলেন মূসা (আ.) এর কাছে। যেদিন তোমার সত্যতা এবং সত্যতায় লোকেরা তোমার উপর নানাভাবে জুলুম-নির্যাতন করবে এবং তোমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে সেদিন যদি আমি শক্তিমান এবং জীবিত থাকতাম তবে অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করতাম।”

ওয়ারাকার মুখ থেকে একথা শুনে রাসূল সা. অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “ওরা আমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে?” ওয়ারাকা বললেন, “হ্যাঁ তারা অবশ্যই তোমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে। তুমি নয়, অতীতে এরকম বহু ঘটনা ঘটেছে। যখনই সমাজে সত্যের বার্তা নিয়ে কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেছে তখনই তার সত্যতায় লোকেরা তার উপর নানাভাবে জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে এবং তাকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে। মনে রাখো আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে সর্বপ্রকারে তোমাকে সাহায্য করবো।”এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ওয়ারাকা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূল সা. এর উপর ঈমান এনেছিলেন।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, খাদিজা রা. একবার নবীজি সা. কে আরজ করলেন, “ওয়ারাকা আপনার নবুয়্যাত ও রিসালাত প্রত্যয়নে কিছু দিনের প্রকাশ দাওয়াতের

পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।” রাসূল সা. হেসে বললেন, “আমি ওয়ারাকাকে স্বপ্নে দেখেছি যে তিনি সাদা পোশাক পরিহিত আছেন। যদি জাহান্নামের অধিবাসী হতেন তবে অন্য কোন রঙের পোশাক পরিহিত থাকতেন।” (তিরমিযী)
মুসনাদে হাকীম আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, “ওয়ারাকাকে মন্দ বলো না। তার জন্য আমি জান্নাতে একটি অথবা দুটি বাগান দেখেছি।”
এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনার পর বেশকিছু দিন বন্ধ ছিল ওহির ধারাবাহিকতা। এরপর আবার ওহি চালু হয়।শুরু হয় কুরআনুল কারিম নাযিল।

ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ

গোপনে ইসলাম প্রচার:

দ্বিতীয় পর্যায়ে ওহীর অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল ﷺ কে ইসলাম প্রচারের জন্য আদেশ করা হয়; কিন্তু তখন বিশ্বজুড়ে ছিলো ধর্মহীনতা ও পাষণ্ডতার জয়জয়কার। বিশেষ করে, আরবদের মিথ্যা আহংকার ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ ধর্ম অনুসরণ তাদেরকে সত্যের দিকে কর্ণপাত করার জন্য বিদ্রোহী ও উদ্ধত করে রেখেছিল। তাই শুরুতে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ না দেওয়া;; যেন সাধারণ মানুষ শুরু হতেই ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করেন।। রাসূল ﷺ প্রথমে তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত লোকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। স্বীয় দূরদর্শিতা অনুযায়ী তিনি যাদের মাঝে পূণ্য ও কল্যাণের নিদর্শন দেখতে পেতেন; তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতেন।

খাদিজার ইসলামগ্রহণ, তার অনুপম অবদান:

সর্বপ্রথম ইসলামগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা। দাম্পত্য সম্পর্কের সুবাদে নবিজি ﷺ এ সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য ও সাহচর্য পেয়েছেন তিনি। আরও পেয়েছেন নবিজির সেবা করার অফুরন্ত সুযোগ। তাই সর্বসাধ্য দিয়ে যেকোনো

পরিস্থিতিতে তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। নিজের সর্বটুকু উজাড় করে দিয়ে আগলে রাখেন তাকে।

দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে নবিজি ﷺ যখনই কষ্টের শিকার হয়েছেন, তখনই এগিয়ে এসেছেন খাদিজা। পরম ভালোবাসায় তার কষ্টের অনুভূতি লাঘব করার চেষ্টা করেছেন। নবিজিকে তিনি সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জুগিয়েছেন, প্রেরণা দিয়েছেন।

আলি রাঃ ও যাইদ রাঃএরইসলামগ্রহণ:

আলি রাযিয়াল্লাহু আনহার পর আলি ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স মাত্র ১০ বছর। ইসলামগ্রহণের আগে নবিজির প্রতিপালনে ছিলেন তিনি। যে বছর আরবে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, সে বছর চাচা আবু তালিবের কাছ থেকে আলির দায়িত্ব নেন নবিজি। এরপর থেকে নবিজির পরিবারের সদস্য হিসেবে বেড়ে ওঠেন তিনি।

তারপর ইসলাম গ্রহণ করেন যাইদ ইবনুল হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহু। প্রথম দিকে নবিজির গোলাম ছিলেন যাইদ রাঃ। পরবর্তী সময়ে তাকে আজাদ করে পালকপুত্রের মর্যাদা দেন নবিজি।প্রথম দিকে ইসলাম-গ্রহণকারীদের তিনজন—খাদিজা, আলি ও যাইদ—সবাই নবিজির পরিবারের সদস্য; তারা নবিজির অত্যন্ত কাছের মানুষ। নবিজির প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব তাদের চোখের সামনে। তার সততা, একনিষ্ঠতা ও অনুপম চরিত্রমাধুরী সম্পর্কে তাদের চেয়ে বেশি আর কারও জানা ছিল না। পৃথিবীর অন্য যে কারও তুলনায় নবিজির সবচেয়ে ভালো করে জানতেন তারাই। তাই কাছের মানুষদের ইসলামগ্রহণ নবিজির নবুয়তের সত্যতার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য বহন করে।

আবু বকরের ইসলামগ্রহণ, দাওয়াতের পথে তার অবদান:

তারপর ইসলাম গ্রহণ করেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। কুরাইশদের কাছে অত্যন্ত বরেণ্য ও সম্মানিত ব্যক্তি তিনি। প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি, উচ্চ মনোবল, ভরসাময়

মেজাজএবং পরিমিতিবোধের কারণে তিনি তখন সকলের সমীহের পাত্র। এ অবস্থায় তার ইসলামগ্রহণ কুরাইশদের কাছে অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার হয়ে ওঠে। তাছাড়া ইসলামগ্রহণের বিষয়টি তিনি লুকিয়ে রাখেননি। প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন নিজের ইসলামগ্রহণের কথা।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সবার হৃদয় ছুঁয়ে যেত। তার সুবার-সরলতায় বিমোহিত হতো সবাই। কুরাইশদের বংশধারা ও ইতিহাস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন তিনি। নীতিবান সফল ব্যবসায়ী হিসেবেও তার বেশ সুনাম ছিল।
মোটকথা, আবু বকরের শুভাকাঙ্ক্ষী, গুণগ্রাহী ও পরিচিত মহল যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল। এই পরিচিতি ও সুখ্যাতিকে তিনি ইসলাম প্রচারের কাজে লাগান। যাদের প্রতি তার আস্থা আছে, যাদের তিনি চেনেন বা যাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা করেন, তাদের মাঝে তিনি ইসলাম প্রচার শুরু করেন।প্রাপ্তবয়স্ক এবং বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষদের মধ্যে তিনি সবার প্রথম ইসলাম গ্রহন করেন।

কুরাইশের অভিজাত শ্রেণির কালেমা পাঠ:

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাওয়াত ও প্রচারের ফলে কুরাইশের বিখ্যাত কয়েকজন শীর্ষ নেতা ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—

উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু, যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুর রহমান ইবনু আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু, সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, তালহা ইবনু উবায়দিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে নবিজির দরবারে হাজির করলে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম কবুল করেন।

তাদের পরপরই কুরাইশের আরও অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন খুবই অভিজাত ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এ পর্বে ইসলাম-গ্রহণকারীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম—

আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আরকাম ইবনু আবিল আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু, উসমান ইবনু মাজউন রাদিয়াল্লাহু আনহু, উবায়দা ইবনুল হারিস ইবনি আবিল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু, সা'দ ইবনু যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু, খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু, সুহায়ব রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ।

এরপর থেকে লোকেরা বিপুল সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। পুরো একটি দল একসাথে ইসলাম গ্রহণ করে। দূর-দূরান্ত থেকে প্রতিনিধিদল আসে ইসলামগ্রহণ করতে। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও এক কাফেলায় শরিক হতে থাকে।এভাবেই একসময় ইসলাম মক্কার আকাশে-বাতাসে,পথে-প্রান্তরে প্রতিধ্বনি হতে শুরু করে।

সালাত আদায় :

ইবনে হাজার আসকালানী রহ.বলেন,রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ মিরাজের পূর্বে থেকেই সালাত আদায় করতেন।তবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয হওয়ার পূর্বে তা ফরয ছিল কি না সে বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন, সূর্যের উদয়-অস্ত এ দুই সময়ে নামাজ ফরয ছিল।

এভাবে তিন বছর অতিক্রম হওয়ার পর ইসলামের দাওয়াত কিছু সংখ্যক লোকের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ তখনও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারেরর হুকুম আসে নি।সেজন্য রাসূল ﷺ তা লোকসমাজে প্রকাশ করতেন না;কিন্তু কুরাইশরা ইসলাম সম্পর্কে সমস্ত খবরাখবর জানতেন।যেহেতু রাসূল ﷺ তাদের সাথে ইসলাম তিনি কোনো আলোচনা করে নি তাই তারা শুধু লোক সমাজে গুঞ্জন শুনে চলতো। আবার কেউ কেউ তাঁর প্রতি ঘৃণাও প্রকাশ করত।মুমিনদের সাথে শত্রুতাভাব দেখাতো।

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার

প্রকাশ্য দাওয়াতের আদেশ:

তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচারের পর কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ কে প্রকাশ্য ইসলামের দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ দিলেন—

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
"আর আপনি সতর্ক করুন আপনার নিকটাত্মীয় স্বজনদের।"(সূরা শুআরা:২১৪)

প্রকাশ্যে প্রথম আহ্বান:

উল্লিখিত সূরা শুআরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল ﷺ বনু হাশিম গোত্রকে একত্রিত করে এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। বনু মুতালিবের প্রায় ৪৫ জন লোক এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। রাসূল ﷺ যখন তাঁর আলোচনা শুরু করবেন এমন সময় হঠাৎ আবু লাহাব বলে উঠলো, দেখো! এরা সকলেই তোমার নিকট আত্মীয়। বাচালতা বাদ দিয়ে এদের সাথে ভালোভাবে কথাবার্তা বলবে। তোমার জন্য সকল আরববাসীর সাথে শত্রুতা করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি স্বীয় কথায় অবিচল যদি থেকো তাহলে তোমার বিরুদ্ধে কুরাইশ গোত্র অস্ত্রধারণ করবে। তারপর আমার জানার দরকার নেই যে, নিজ পিতৃপরিবারের মধ্যে আর অন্য কেউ তোমার চেয়ে বেশি সর্বনাশা আছে কিনা? আবু লাহা বের এধরণের অর্থহীন কথা দিয়েই সেদিন আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

প্রকাশ্যে দ্বিতীয় আহ্বান:

প্রথম দাওয়াতের কয়েক দিন পর রাসূল ﷺ স্বগোত্রীয় লোকদের একত্রিত করে দ্বিতীয় বারের মতো আলোচনার ব্যবস্থা করেন। এবং তিনি তাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন।
তিনি বলেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, আমি তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি এবং তাঁর উপর ভরসা

করছি। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কোনো মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। অতঃপর তিনি বলেন, 'কল্যাণকামী পথপ্রদর্শক কখনোই স্বীয় আত্মীয়-স্বজনদের সামনে মিথ্যা বলতে পারে না। সে আল্লাহর শপথ! যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। বিশেষভাবে তোমাদের জন্য এবং সাধারণভাবে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য আমি আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহর কসম, তোমরা সকলে ঠিক সেভাবে মৃত্যুবরণ করবে; যেভাবে তোমরা (প্রতিদিন) ঘুমাও। এবং তোমরা সেভাবে পুনরুত্থিত হবে, যেভাবে তোমরা (পুনরায়) ঘুম থেকে উঠো।সেদিন তোমাদের হিসাব গ্রহণ করা হবে। ফলে ভালো-খারাপ কর্মের ভিত্তিতে তোমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।"

এ কথা শুনে আবু তালিব বললেন, আমরা তোমার কতটুকু সাহায্য করতে পারবো? তোমার উপদেশ, তোমার সত্য কথা আমরা কতটুকু মানবো? এখানে আগত সকলের মতো আমিও তোমার পরিবারের একজন সদস্য। ব্যবধান শুধু এই যে, আমি অন্য লোকদের তুলনায় সাহায্য করার দিক থেকে অগ্রগামী। তাই তোমার নিকট যে নির্দেশ এসেছে; সে অনুযায়ী কাজ করো। আল্লাহ ভরসা, আমি অবিরাম তোমার সাহায্য করে যাবো। তবে আমি আব্দুল মুত্তালিবের দ্বীন ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই।

আবু লাহাব বললেন, আল্লাহর কসম! এসব অন্যায় কথা।এর হাত অন্য লোকদের আগে তোমরাই ধরে নাও।

আবু তালিব আবু লাহাবের মুখ থেকে এমন কথা শোনামাত্রই বললেন, আল্লাহর কসম! যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে, আমি তাঁর হেফাজত করে যাবো।

দাওয়াত বন্ধের পদক্ষেপসমূহ

উতবা ইবনে রবিয়ার সাথে রাসূল ﷺ এর আলোচনা:

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) একদিন মসজিদে হারামে একাকী বসে ছিলেন। তখন উতবা ইবনে রবিয়া কুরাইশদের মজলিসে গিয়ে বলল, "আমি মুহাম্মদের কাছে গিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই। এ ব্যাপারে তোমাদের মত কি? আমি তার সামনে কিছু প্রস্তাব রাখবো। আশা করি সে তার কিছু না কিছু গ্রহণ করবে। সে যে সুবিধা চায়, তা আমরা তাকে দেব। ফলে সে আমাদের নিন্দা করা থেকে বিরত থাকবে!" তারা বলল, "ঠিক আছে তুমি যাও এবং তার সাথে কথা বল।" উতবা এসে রাসূল সা. এর কাছে বসল এবং আলাপ শুরু করল। সে বলল, "হে আমার প্রিয় ভাতিজা! তুমি আমাদের সাথে বংশীয় বন্ধন এবং আত্মীয়তার মর্যাদার দিক দিয়ে কোন পর্যায়ে আছ তা তোমার জানা আছে। তুমি তোমার কওমের সামনে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেশ করেছ, যা দিয়ে তুমি তাদের দলকে বিভক্ত করছ। তাদের জনীদের বোকা সাব্যস্ত করছ। তাদের ধর্ম দেবদেবীর নিন্দা করেছ এবং তাদের পূর্বপুরুষদের কাফির বলে অভিযুক্ত করেছ। এখন আমার কথা শোনো! আমি কয়েকটি প্রস্তাব তোমার কাছে তোমার বিবেচনার জন্য রাখছি। হয়তো তা থেকে কিছু তুমি গ্রহণ করবে!" তখন রাসূল (সা.) তাকে বললেন, "বলুন, আমি শুনছি।"

উতবা বলল, "আমার প্রিয় ভাতিজা! তুমি যে ব্যাপারটি নিয়ে এসেছ, তার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে তুমি বিশ্বশ্রী হতে চাও, তাহলে আমরা তোমার জন্য এত সম্পদ ব্যয় করা দেবো যাতে তুমি আমাদের মাঝে সবচাইতে ধনী হয়ে যাও। যদি পদমর্যাদা চাও, তাহলে তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে দেব এবং তোমাকে বাদ দিয়ে কোন ব্যাপারেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব না। যদি রাজা হতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে রাজা বানিয়ে দেব। আর যদি মনে করো যে যে ব্যক্তি (জিবরীল) তোমার কাছে আসে, যাকে তুমি দেখতে পাও সে এমন কেউ যাকে তুমি প্রতিহত করতে অক্ষম, তাহলে আমরা তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। এতে আমাদের যত অর্থ খরচ হোক না কেন, আমরা এর থেকে তোমাকে মুক্ত করবোই।" এভাবে সে আরও নানা কথা বলল। রাসূল নির্বিকারে তার কথা শুনছিলেন। তার কথা শেষ হলে রাসূল (সা.) বললেন, "হে আবুল ওয়ালীদ! আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?"সে বলল, "হ্যাঁ!"তখন রাসূল বললেন, "তাহলে আমার

বক্তব্য শুনুন!” এই বলেই তিনি বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা হা-মীম সিজদার ১ থেকে ১৩ নং আয়াত তেলাওয়াত করলেন।উতবা পিঠের

পেছনে হাত রেখে হেলান দিয়ে শেষ পর্যন্ত শুনলেন। তারপর রাসূল সা. বললেন, “হে আবুল ওয়ালীদ! শুনলে তো। এখন আপনি বিবেচনা করুন।” উতবা সেখান থেকে উঠে কুরাইশ নেতাদের কাছে ফিরে গেলেন। তখন তারা বলতে লাগল, “আল্লাহর কসম! আবুল ওয়ালীদ যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিল, এখন তার থেকে চেহারা নিয়ে এসেছে!” তাদের কাছে বসলে তারা বলল, “হে আবুল ওয়ালীদ! সেখানকার খবর কি?” উতবা বলল, “সেখানকার খবর এই যে, আল্লাহর কসম! আমি এমন কথা শুনেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, তার থেকে যে কথা আমি শুনেছি, তা একদিন বিপুল খ্যাতি অর্জন করবে। আর যদি কেউ তার ক্ষতি সাধন করে তাহলে তোমরা মনে করবে যে, তারা তোমাদের কাজ সম্পন্ন করে দিয়েছে। আর যদি সে বিজয়ী হয় তবে তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্মান তোমাদেরই হবে। তেমন হলে তোমরা সবচেয়ে সুখী ও সৌভাগ্যশালী জাতিতে পরিণত হবে।”একথা শুনে সবাই বলল, “আল্লাহর কসম! সে তোমাকে নিজের কথা দিয়ে জাদু করে ফেলেছে মনে হয়েছে।”তিনি বললেন, “এ আমার অভিমত। এখন তোমাদের যা ভালো মনে হয় তাই করো।”

কুরাইশদের বিরোধিতা:

কুরাইশরা যখন বুঝতে পারলো, নবীজির ﷺ আনীত এই দাওয়াত তাদের পৌত্তলিকতার ভিত্তিকে ভেঙ্গে দিবে এবং নবীজি ﷺ তাঁর এই দাওয়াতের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ অবিচল।এবং তিনি তাদের কোনো কথা কিংবা কাজকে পাত্তা দিচ্ছেন না, তখন কুরাইশরা তাদের একটি দলকে পিতৃব্য আবু তালিবের কাছে খবর দিয়ে পাঠায়।যেন আবু তালিব নবী মুহাম্মাদকে তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা এবং তাদের মূর্তির ইজ্জতহানি থেকে বাধা দেন।

আবু তালিব নবী মুহাম্মাদকে ডাক দিয়ে উপদেশস্বরূপ বললেন, “ভাতিজা আমার, আমাকে এবং তোমার নিজেকে রেখে থাকতে দাও। আমি যে-বিষয়ে অঙ্গীকার করেছি, তা আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ো না!” নবী ﷺ উত্তরে বললেন, “আল্লাহর শপথ!হে চাচা,

তারা যদি এই দাওয়াতি কার্যক্রম বন্ধ করার শর্তে আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ রাখে, তবুও তা বন্ধ করা সম্ভব নয়!"

রাসূলের ﷺ এই এক কথাই আবু তালিবকে দেওয়া কুরাইশদের সেই আবেদন এবং সতর্কতা ভুলিয়ে দিতে যথেষ্ট ছিলো। শেষ পর্যন্ত তিনি নবী মুহাম্মাদকে ﷺ এ-কথা বলতে বাধ্য হলেন, "তুমি তোমার পছন্দমতো কথা বলো যাও এবং তোমার এই দাওয়াতি কার্যক্রম চালিয়ে যাও!"

কুরাইশদের প্রবল বাধা ও তীব্র হুমকি:

ইসলামের দাওয়াতি পরিক্রমা রুখতে কুরাইশদের তৎপরতা দিনদিন বেড়েই যাচ্ছিলো। অপরদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো মুসলমানদের সংখ্যাও। দুইজন বিশেষ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ দ্বারা আরও সুদৃঢ় হয় ইসলামের শক্তি। কারণ, কুরাইশদের মাঝে এই দুই ব্যক্তির ছিল যথেষ্ট প্রভাব। একজন হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.), অপরজন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)।
এরপর তারা মুসলমানদেরকে বয়কট করার ষড়যন্ত্র করে। কুরাইশদের সাথে শাখা-গোত্র বনু হাশেম ও বনু আব্দুল মুত্তালিবের মধ্যে এবং মুসলমানদের মাঝে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সব ধরনের লেনদেন নিষেধাজ্ঞার ওপর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে সকল মুসলিমরা ভয়াবহ বিপর্যয়ের শিকার হন। তবে কিছু কিছু কুরাইশ এই ঘৃণ্য চুক্তির বিরোধিতা করে এবং এটা শেষ করার জন্য কাজ করে। অবশেষে তিন বছর পরে এটার পরিসমাপ্তি ঘটে।
এ দিকে মক্কাবাসী কিংবা মক্কাতে বহিরাগত যার সাথেই রাসুলের সাক্ষাৎ হতো, তাকেই তিনি আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতেন। তার দাওয়াতি কার্যক্রম দিন দিন ফলপ্রসূ হচ্ছিল। কিন্তু নবুওয়াতের দশম হিজরিতে একই সাথে দুটি বড় বিপদ। এই বিপদ দুটি রাসুলের ওপর প্রভাব ফেলে প্রবলভাবে। দুটি মসিবতের একটি ছিল—তার সাথে দুঃখ-কষ্টে সর্বদা সঙ্গিনী হয়ে-থাকা খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদের ইন্তেকাল। খাদিজার ইন্তেকালের ৪০ দিন পর পিতৃব্য আবু তালিবের ইন্তেকাল ছিল দ্বিতীয় মসিবত। আবু তালিবের মৃত্যুর পর নবীজির ওপর কুরাইশরা ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। কুরাইশদের নির্বোধেরা অসম্ভব কষ্ট দেয় রাসুলকে।

কুরাইশদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ :

কাফিররা রসূল ﷺ কে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা, বিদ্রুপ করা, অপমান করা এমনকি অবজ্ঞা করাও বাদ রাখত না। রাসূলকে কাফিরদের উপহাস করা প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআনে বলেন,

তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন আপনাকে কেবল বিদ্রুপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে, বলে, এ-ই কি সে যাকে আল্লাহ 'রাসূল' করে প্রেরণ করেছেন?

(সূরা আল ফুরকান, ২৫:৪১)

বিদ্রূপকারীদের জন্যে আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট। যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। অতএব অতিসত্বর তারা জেনে নেবে।

(সূরা আল হিজর, ১৫:৯৫-৯৬)

নিশ্চয় আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথেও উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাঁদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে ঐ শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত। (সূরা আল আন'আম, ৬:১০)

অপমান:

কুরাইশরা রাসূল ﷺ কে যেভাবে পারত সেভাবেই অপমান করত। একদিন উকবা ইবনে আবি মুয়াইত কাবার পাশে রসূলকে দেখতে পেয়ে রসূলের কাপড়ে হেঁচকা টান মেরে সেটা তার গলায় প্যাঁচানো শুরু করল, তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলার জন্য। এই দৃশ্য দেখে আবু বকর রা: দৌড়ে আসেন এবং তাকে সরিয়ে দিয়ে মহানবীকে বাঁচালেন। আল্লাহর রাসূল অনেক আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বোধ মানুষ ছিলেন তাই তিনি তাদের ব্যবহারে অনেক বেশি কষ্ট পেতেন কিন্তু কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন না। তাদের উপেক্ষা করতেন এবং বারবার তাদের দাওয়াত দিতেন। এমনকি একদিন রসূল সালাত আদায় করছিলেন আবু জেহেলের প্ররোচনায় উকবা ইবনে আবি মুয়াইত উটের নাড়িভুঁড়ি নিয়ে আসলো, যখন আল্লাহর নবী সিজদায় গেলেন তখন তার পিঠের উপর নাড়ি ভুঁড়ি চাপিয়ে দিল। মহানবী সিজদা থেকে উঠতে পারছিলেন না। ফাতেমা রা: দূর থেকে দেখতে পেলেন এবং ছুটে আসলেন। এবং আবর্জনা সরিয়ে রাসূলকে উঠতে সাহায্য করলেন।

কুরাইশ নেতাদের গোপনে কুরআন পাঠ শ্রবণ:

ইবনে ইসহাক বলেন, একদিন রাতে আবু সুফিয়ান, আবু জাহাল এবং আখনাস ইবনে শুরায়ক রাসূলের কুরআন শুনতে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু তারা একে অপরের কথা কেউই জানত না। এ সময় রাসূল (সাঃ) নিজের ঘরে রাতের সালাত আদায় করছিলেন। এই তিনজনের প্রত্যেকে আলাদা আলাদা জায়গায় বসে রাসূল (সাঃ) এর কুরআন শুনতে লাগল। এভাবে কুরআন শুনতে শুনতে তারা সারা রাত কাটিয়ে দিল। যখন ভোর হলো তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থান থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু পথিমধ্যে সকলের দেখা হয়ে গেল। তখন তারা পরস্পরকে তিরস্কার করে বলল, "খবরদার এমন কাজ আর কখনো করবে না। যদি নির্বোধ লোকেরা তোমাদেরকে দেখে ফেলে তাহলে তাদের মনে তোমাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হবে।" একথা বলে সবাই নিজ নিজ ঠিকানায় চলে গেল। পরদিন রাতে আবার তিনজন নিজ নিজ গোপন জায়গায় গিয়ে বসলো এবং সারা রাত কুরআন তেলাওয়াত শুনলো। তারপরে ভোরবেলা বের হলে আবার দেখা হয়ে গেল। এরপর আবার আগের দিনের মতো কথাবার্তা বলে চলে গেল। তৃতীয় দিনও একই ঘটনা ঘটল। এবারও তারা আগের মতো অঙ্গীকার করে যার যার পথে চলে গেল। পরদিন সকালে আখনাস ইবনে শুরায়ক লাঠি নিয়ে রওনা হলো এবং আবু সুফিয়ান কে বললো, "হে আবু হানজালা! তুমি মুহাম্মদ এর কাছ থেকে যা শুনলে সে সম্পর্কে তোমার মতামত জানাও।" সে বলল, "হে আবু সালাবা! শোনো, আল্লাহর কসম! কিছু কথা এমন শুনলাম যা আমি জানি এবং তার অর্থ বুঝি। আর কিছু কথা এমন শুনলাম যার অর্থ ও মর্ম আমার জানা নেই।" তখন আখনাস বলল, "আল্লাহর কসম! আমার অবস্থাও এমন।" এরপর আখনাস তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবু জাহেলের বাড়িতে গিয়ে তাকেও একই প্রশ্ন করল। সে বলল, "আমরা এবং বনু আব্দে মানাফ কুরাইশ বংশের সাথে দীর্ঘকাল ধরে মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। আপ্যায়ন ও ভোজের আয়োজন তারাও করেছে, আমরাও করেছি। তারা সামাজিক দায়-দায়িত্ব বহন করেছে, আমরাও করেছি। সবকিছুতে তারাও বদান্যতা দেখিয়েছে, আমরাও দেখিয়েছি। এভাবে যখন আমরা সমানতালে চলেছি তখন হঠাৎ তারা দাবি করল, তাদের মধ্যে একজন নবী আছেন! যার কাছে আসমান থেকে ওহী আসে এই পর্যায়ে আমরা কিভাবে তার সমকক্ষ হব? আল্লাহর কসম! আমরা তার উপর কখনোই ঈমান আনব না এবং তাকে সত্যবাদী বলে স্বীকৃতি দেবো না।" একথা শুনে আখনাস তার কাছ থেকে বিদায় নিল।

হিজরত

আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত :

নবুয়তের চতুর্থ বর্ষের মাঝামাঝি কাফেরদের অত্যাচার ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। পঞ্চম বর্ষে গিয়ে তা সহ্যের সীমা অতিক্রম করার মতো অবস্থাতে দাঁড়ায়। এমন অবস্থায় দ্বীন ইসলাম ও ঈমানের উপর কায়েম থাকা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠলো। তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেন,

বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত। (সূরা যুমার, ৩৯:১০)

এই আয়াত নাযিল করার মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিমদেরকে নিরাপদ ভূমিতে পাড়ি জমানোর অনুমতি দিলেন। এই সময় রাসূল সাহাবিদেরকে বললেন, "তোমরা আল্লাহর জমিনের কোথাও হিজরত করে চলে যাও। শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রিত করবেন"। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কোথায় যাব?" রাসূল তখন আবিসিনিয়ার দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, "সেখানে এক ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ আছে যার সাম্রাজ্যে কেউ কারও উপর জুলুম করতে পারে না"।

এই ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ হলেন নাজ্জাশি, যার প্রকৃত নাম ছিল 'আসহামা' অথবা 'আসহামা'-অবশেষে নবুওয়াতের ৫ম বর্ষের রজব মাসে ১৬ জন সাহাবির একটি দল আবিসিনিয়ার পথে পাড়ি জমান। এই দলে ছিলেন ১১ জন পুরুষ এবং ৫ জন নারী।

পুরুষ সাহাবিগণ হলেন-

উসমান ইবনে আফফান রা:

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা:

যুবায়ের ইবনে আওয়াম রা:

আবু হুযায়ফা ইবনে উতবা রা:

মুসআব ইবনে উমায়র রা:

আবু সালামা ইবনে আব্দুল আসাদ রা:

উসমান ইবনে মাযউন রা:

আমের ইবনে রাবিয়াহ রা:

সুহায়ল ইবনে বায়যা রা:
আবু সাবরা ইবনে আবু রুহম আমিরী রা:
হাতিব ইবনে আমর (ইবনে ইসহাক তাঁর নাম উল্লেখ করেননি, তবে হাফিয ইবনে সায়্যিদুন নাস উল্লেখ করেছেন)
মহিলা সাহাবিগণ হলেন-
রুকাইয়া রা (রাসূল এর কন্যা এবং উসমান এর স্ত্রী)
সাহলা বিনতে সুহায়ল রা (আবু হুযায়ফা এর স্ত্রী)
উম্মে সালামা বিনতে আবি উমাইয়্যা রা: (আবু সালামা এর স্ত্রী)
লায়লা বিনতে আবু হাসমা রা : (আমের ইবনে রাবিয়াহ এর স্ত্রী)
উম্মে কুলসুম বিনতে সুহায়ল ইবনে উমর রা : (আবু সাবরা এর স্ত্রী; ইবনে ইসহাক তাঁর নাম উল্লেখ করেননি, তবে হাফিয ইবনে সায়্যিদুন নাস উল্লেখ করেছেন)ওয়াকিদী রাহি. এই দলের মাঝে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এর নামও উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনে ইসহাক এবং হাফিয ইবনে হাজার আসকালানি রাহি. উভয়েই বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতকারী দলের মাঝে ছিলেন।
১৬ জনের এই দলটি গোপনে মক্কা থেকে রওনা হলেন। তাদের কেউ বাহনে আবার কেউ হেঁটেই রওনা দিলেন। জেদ্দার সমুদ্র বন্দরে গিয়ে তাঁরা দেখলেন সেখানে দুটি জাহাজ আবিসিনিয়া যাওয়ার জন্য নোঙ্গর করে আছে। পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে তারা সাহাবিদের এই দলটিকে জাহাজে তুলে নিলেন। ওদিকে কুরাইশরা খবর পেয়ে সাহাবিদের এই দলটিকে ধরার জন্য রওনা দিল। কিন্তু তারা বন্দরে পৌঁছার পূর্বেই জাহাজ ছেড়ে দিল এবং সাহাবিগণ নিরাপদে আবিসিনিয়া গিয়ে পৌঁছলেন। এই দফায় তাঁরা রজব থেকে শাওয়াল মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেছিলেন।
আবিসিনিয়াতে হিজরতের কিছু কারণ ছিল। সাহাবীরা নিজেদের ঈমান বাঁচাতে এবং সত্যদিনের অনুসারী হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশায় মক্কা ছেড়ে হিজরত করেছিলেন। যতই মুসলমানের সংখ্যা বাড়তে শুরু করল ততই কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে লাগল। আবিসিনিয়ায় হিজরতের আরেকটি প্রধান কারণ ছিল শুধুমাত্র অত্যাচার বা নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য না, মহানবী চাচ্ছিলেন মক্কার বাইরেও একটি নিরাপদ ভূমি তৈরি করতে। যে স্থান থেকে নবীজি ইসলাম প্রচার করতে সহায়তা পাবেন।

আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশী ছিলেন একজন ন্যায় পরায়ন বাদশা। তার রাজ্যে জুলুম হতো না তাই দীন পালনের জন্য মুসলমানদের খুব বেশি কষ্ট হবে না। কুরাইশদের সাথে আবিসিনিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। তাই আবিসিনিয়া সম্পর্কে সমস্ত সাহাবীদেরই আগে থেকে জানাশোনা ছিল। মুহাজিররা প্রায় তিন মাস হাবশায় নিরাপদে বসবাস করে। তখন মক্কার কিছু ভুল ঘটনা শুনে এবং মক্কায় ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। অনেকেই প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকেন। আরবে ইসলাম আরো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এবং তখনই মুহাজিররা মক্কায় ফিরে আসে।

আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত:

কিছুদিন পর মুসলমানদের নির্যাতনের মাত্রা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেল। রাসূল ﷺ এর আদেশ পাওয়ার পর সাহাবীগণ পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরতের প্রস্তুতি নেন। এবার একটি বড় কাফেলা হিজরতের প্রস্তুতি নেয়। এই দফায় তাদের সংখ্যা ছিল ৮৩ জন পুরুষ এবং ১২ জন নারী। আবিসিনিয়ার প্রথম মহা জীবদের মধ্যে উসমান ইবনে আফফান এবং মুসআব ইবনে উমাইর রা: দ্বিতীয়বার হাবশায় হিজরত করেননি। এছাড়াও আবু মুসা আশআরী রা: ইয়েমেন থেকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

সাহাবিদেরকে আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফেরানোর জন্য কুরাইশদের নতুন চক্রান্ত:

আবিসিনিয়ায় গিয়ে বাদশাহ নাজ্জাশির কাছে মুহাজির মুসলিমদের নামে অভিযোগ দায়ের করে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য কুরাইশরা আমর বিন আস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রাবিয়া-কে দূত মনোনীত করে। তাদের কাছে নাজ্জাশি এবং তাঁর উপদেষ্টাবর্গের জন্য অনেক মূল্যবান উপহারও দিয়ে দেয় তারা।

নাজ্জাশির দরবারে গিয়ে তারা তাদের সকল মিথ্যা বিবরণ ও মিথ্যা প্রমাণাদি উপস্থাপন করলো আর পুরোহিতগণকে বিপুল পরিমাণে উপঢৌকন প্রদান করল। যদিও সে সকল বিবরণ একেবারেই মিথ্যে ছিল তবুও বিপুল পরিমাণে উপঢৌকন পাওয়ায় পুরোহিতগণ সিদ্ধান্ত নিলেন তারা মুসলিমদেরকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে সম্রাটকে পরামর্শ দিবেন। পুরোহিতদের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে কুরাইশ দূতগণ বাদশা নাজ্জাশির দরবারে উপস্থিত হল। তারা বাদশাহ নাজ্জাশিকে বলল- 'হে মহামান্য সম্রাট! আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক অবোধ ও অর্বাচীন যুবক আমাদের দেশ থেকে পলায়ন করে আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাঁরা তাদের পূর্ব পুরুষগণের নিকট থেকে বংশপরম্পরা

সূত্রে চলে আসা ধর্মমত পরিত্যাগ করেছে। আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে আপনার ধর্মমতও গ্রহণ করেনি। এ হচ্ছে তাঁদের চরম ধৃষ্টতার পরিচায়ক। শুধু তাই নয়, এরা নাকি একটিধর্মমতও আবিষ্কার করেছে। এর চেয়ে আজগুবি ব্যাপার আর কী হতে পারে বলুন? আমাদের গোত্রীয় প্রধান এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, এ সকল অর্বাচীনের পিতামাতা, মুরুব্বি ও আত্মীয়-স্বজনগণ তাদেরকে স্বদেশে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে আমাদের দুজনকে দূত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে ওদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। আমাদের প্রধানগণ এঁদের ভালোমন্দ সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝেন এবং তাদের অসন্তোষের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল রয়েছেন।'

কুরাইশরা এই প্রস্তাব পেশ করার পর নাজ্জাশির পুরোহিতগণ উপদেশ দিলেন এদের হাতে মুহাজির মুসলিমদের তুলে দেওয়ার জন্য। কুরাইশদের কথা শোনার পর নাজ্জাশি কিছুক্ষণ গভীর চিন্তা করলেন। এরপর বললেন, 'এই বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের পূর্বে কোন মন্তব্য করা কিংবা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না।' একথা বলেই তিনি মুসলিমদেরকে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য ডেকে পাঠালেন। মুসলিমগণ আল্লাহর উপর ভরসা করে সঠিক তথ্য প্রকাশের জন্য বাদশার দরবারে উপস্থিত হলেন।

সম্রাট নাজ্জাশি তাঁর দরবারে উপস্থিত মুসলিমদের লক্ষ্য করে বললেন, 'যে ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণে যুগ যুগ ধরে পূর্ব পুরুষগণের বংশপরম্পরা সূত্রে চলে আসা ধর্ম তোমরা পরিত্যাগ করেছ এবং এমনকি আমাদের দেশে আশ্রিত হয়েও তোমরা আমাদের ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছ সে ধর্মটি কোন ধর্ম?'

প্রত্যুত্তরে মুসলিমদের মনোনীত মুখপাত্র হিসেবে জা'ফার বিন আবু তালিব অকপটে বলে চললেন-

'হে সম্রাট! আমরা ছিলাম অজ্ঞতা, অশ্লীলতা ও অনাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত দুষ্কর্মশীল এক জাতি। আমরা মুর্তি পূজা করতাম, মৃত জীব-জানোয়ারের মাংস ভক্ষণ করতাম, নির্বিচারে ব্যভিচার ও অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকতাম, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে অন্যায় আচরণ করতাম, আমানতের খেয়ানত ও মানুষের হক পয়মাল করতাম এবং দুর্বলদের সহায় সম্পদ গ্রাস করতাম, এমন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ জীবনে আমরা যখন মানবেতর জীবন যাপন করে আসছিলাম তখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে আমাদের মাঝে এক রাসূল প্রেরণ করলেন।

তাঁর বংশ মর্যাদা, সত্যতা, সহনশীলতা, সংযমশীলতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, পরোপকারিতা ইত্যাদি গুণাবলি এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ব থেকেই আমরা অবহিত ছিলাম। তিনি আমাদের আহ্বান জানিয়ে বললেন যে, 'সমগ্র জাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক এক আল্লাহ ছাড়া আমরা আর কারও উপাসনা করব না। বংশ পরম্পরা সূত্রে এ যাবৎ আমরা যে সকল প্রস্তর মূর্তি বা প্রতিমা পূজা করে এসেছি সে সব বর্জন করব। অধিকন্তু মিথ্যা বর্জন করা, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, অশ্লীল অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং রক্তপাত পরিহার করে চলার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া মহিলাদের উপর নির্যাতন চালানো কিংবা মহিলাদের অহেতুক অপবাদ দেওয়া থেকেও বিরত থাকার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা থেকে বিরত থাকার জন্যও তিনি পরামর্শ দেন। অধিকন্তু সালাত, রোযা এবং যাকাতের জন্যও তিনি আমাদের নির্দেশ প্রদান করেন।'

এইভাবেই জা'ফার বিন আবু তালিব অত্যন্ত চিত্তোদ্দীপক এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় ইসলামের মূলনীতি এবং বিধি বিধানগুলো বর্ণনা করলেন। তারপর আবারও বললেন- 'এই পয়গম্বরকে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক স্রষ্টা আল্লাহর পয়গম্বর বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছি এবং তাঁর আনীত দ্বীনে এলাহীর অনুসরণে দৃঢ় প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এর অনুসরণ করে চলেছি। সুতরাং আমরা এক ও অদ্বিতীয় প্রভু আল্লাহর ইবাদত ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করি না এবং বিশ্ব জাহানে কোথাও তাঁর কোনো শরীক আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। পয়গম্বর যেসব কথা, কাজ ও খাদ্য আমাদের জন্য হারাম বলেছেন আমরা সেগুলোকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেছি এবং যেগুলোকে হালাল বলেছেন আমরা সেগুলোকে বৈধ জেনে তার সদ্ব্যবহার করছি। এ কারণে আরব সমাজের বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায় আমাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। তারা চান এ সত্য, সুন্দর, শাশ্বত ও সুনির্মল দ্বীপ থেকে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে অশ্লীলতা এবং অনাচারের গভীর পঙ্কে পুনরায় নিমজ্জিত করতে। কিন্তু আমরা তা অস্বীকার করা অশ্লীলতা এবং অনাচারের গভীর পঙ্কে পুনরায় নিমজ্জিত করতে।কিন্তু আমরা তা অস্বীকার করায় তারা আমাদের উপর নারকীয় নির্যাতন চালিয়েছেন। এক আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে প্রতিমা পূজায় লিপ্ত করানোর জন্য আমাদের উপর আঘাতের উপর আঘাত হেনেছেন, নিদাঘের উত্তপ্ত কংকর ও বালুকারাশির উপর শুইয়ে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে, জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়েছে, পায়ে দড়ি বেঁধে পথে প্রান্তরে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে। এমনকি

এইভাবে যখন তারা আমাদের উপর অবিরামভাবে অন্যায় অত্যাচার চালাতে থাকলেন আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে আল্লাহর জমিনকে আমাদের জন্য সংকীর্ণ করে ফেললেন এবং এমনকি আমাদের ও আমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে ও প্রাণ নাশের হুমকি দিতে থাকলেন তখন আপনার মহানুভবতা, উদারতা, ন্যায়নিষ্ঠার কথা অবগত হয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদের নির্দেশ প্রদান করলেন দেশ ত্যাগ করে আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে। হে সম্রাট! আমরা আপনার সহৃদয়, উদারতা ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়েছি। আমরা চাই আপনার আশ্রয়ের সুশীতল ছায়াতলে অবস্থান করতে। অনুগ্রহ করে এ সব পাষণ্ড যালেমদের (অত্যাচারীদের) হাতে আমাদের সমর্পণ করবেন না।'

সম্রাট নাজ্জাশী বললেন সেই পয়গম্বর যা এনেছেন তার কিছু অংশ তোমাদের কাছে আছে কি? হযরত জা'ফর বললেন, "জি হ্যাঁ।"

নাজ্জাশী বললেন, "তাহলে আমার সামনে পড়ে শোনাও।"

জা'ফর আল্লাহর সমীপে নিবেদিত এবং আত্মা-সমাহিত অবস্থায় সূরাহ মারিয়ামের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন।

নাজ্জাশী এতই মুগ্ধ হলেন যে, তার চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে দাড়ি ভিজে গেল। জা'ফরের তেলাওয়াত শ্রবণ করে নাজ্জাশীর ধর্মীয় মন্ত্রণাদাতাগণও এতই ক্রন্দন করেছিলেন যে, তাদের হাতে রক্ষিত কিতাব পত্রও ভিজে গেল। অতঃপর তাদেরেক উদ্দেশ্য করে নাজ্জাশী বললেন, 'এ কালাম (বাণী) এবং সেই কালাম যা ঈসা (আ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, উভয় কালামই এক উৎস হতে অবতীর্ণ হয়েছে।'

এরপর নাজ্জাশী 'আমর বিন 'আস এবং আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহকে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা যে দুরভিসন্ধি নিয়ে আমার দরবারে আগমন করেছ তা সঙ্গে নিয়েই দেশে ফিরে যাও। তোমাদের হাতে এদের সমর্পণ করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। অধিকন্তু, এ ব্যাপারে এখানে কোনো কূট কৌশলেরও অবকাশ থাকবে না।'

নাজ্জাশীর দরবার থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর তারা নতুন কৌশল করল। আমর বিন আস আব্দুল্লাহ বিন রাবিয়া কে বলল, 'আল্লাহর কসম! আগামীকাল এদের সম্পর্কে এমন প্রশ্ন নিয়ে আসব যা এদের জীবিত থাকার মূল কর্তন করে ফেলবে।' তখন আব্দুল্লাহ ইবনে রাবিয়া বলল, 'না, না! এমনটি করা উচিত হবে না। কারণ এরা যদিও আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তবুও তারা আমাদের স্বজাতি এবং স্বগোত্রীয় লোক এবং আত্মীয়-স্বজনও বটে।'

কিন্তু আমর বিন আস সে কথার গুরুত্ব না দিয়ে নিজ মতের উপরেই স্থির থাকলো। পরদিন নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে আমর বিন আস বললো, 'সম্রাট! এরা ঈসা ইবনে মারিয়াম সম্পর্কে এমন কথা বলে যা কেউ কোনদিন বলেনি। আপনি তাদের কাছ থেকে এটা জেনে নিয়ে এর একটা প্রতিকার করুন।' এ কথা শোনার পর নাজ্জাশী আবার মুসলিমদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং তারা ঈসা ইবনে মারিয়াম সম্পর্কে কী ধারণা রাখে তা জানতে চাইলেন। যেহেতু নাজ্জাশী একজন খ্রিস্টান ছিলেন, তাই তার মুখ থেকে এই কথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিন্তু তারা পরক্ষণেই ঠিক করে ফেললেন যে আল্লাহর উপর আস্থা রেখে যা সত্য এবং রাসূল সাঃ যা শিখিয়েছেন তাই বলবেন। এতে তাদের ভাগ্যে যা থাকে থাকুক। নাজ্জাশীর প্রশ্নের উত্তরে জাফর বললেন, 'আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে আমরা যে শিক্ষা লাভ করেছি তাতে জেনেছি যে ঈসা হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। তাঁর মা মারিয়াম ছিলেন আল্লাহর দৃষ্টিতে উচ্চ মর্যাদার মহিলা। আল্লাহর হুকুম এবং বিশেষ ব্যবস্থায় কুমারী মারিয়ামের গর্ভে ঈসা আঃ এর জন্ম হয়।' একথা শুনে নাজ্জাশী একটুকরো খড় ধরে বললেন, 'আল্লাহর শপথ! যা তোমরা বলেছ ঈসা এর চেয়ে সামান্য পরিমাণও বেশি কিছু ছিলেন না।'

এরপর তিনি মুসলিমদের লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা নির্ভয়, শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে আমার রাজ্যে বসবাস করো। যে কেউ তোমাদের ওপর অন্যায় করবে তার জন্য জরিমানা ও শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হবে। তোমাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের বিনিময়ে আমার হাতে কেউ সোনার পাহাড় এনে দিলেও আমি তা সহ্য করব না।" এরপর নাজ্জাশী তাঁর উপদেষ্টাদের কে বললেন, 'এই কুরাইশদের আনীত উপঢৌকন তাদের ফিরিয়ে দাও। উপঢৌকন আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ যখন আমাকে সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দেন তখন আমার নিকট থেকে উপঢৌকন গ্রহণ করেননি। সে ক্ষেত্রে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে কাজ করতে গিয়ে কিভাবে আমি উৎকোচ গ্রহণ করতে পারি। যেহেতু আল্লাহ আমার ব্যাপারে অন্য লোকেদের কথা গ্রহণ করেননি। আমি কেন লোকের কথা গ্রহণ করতে পারি।' এ কথা শোনার পর কুরাইশ দূতগণ চরম অপমান হয়ে এবং বেইজ্জতির সাথে নাজ্জাশির দরবার থেকে বের হয়ে এলেন এবং মক্কায় ফিরে গেলেন। মুসলিমগণ আবিসিনিয়ায় শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব কে বয়কট :

আবিসিনিয়া থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে ফিরে আসার পর কুরাইশগণ রাসূল সা: ও সাহাবীদেরকে চিরতরে ধ্বংস করার কৌশল হিসেবে মক্কার সকল গোত্রের সমন্বয়ে বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি সম্পাদন করল। তারা প্রথমে বনু হাশেম এবং মুত্তালিব কে বলে মহানবীকে তাদের হাতে তুলে দিতে। রাজি না হওয়াতে তারা তাদের সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করার শর্ত আরোপ করে। তারা একটি অঙ্গীকারনামা তৈরি করে এবং বলে বনু হাশিম, ও বনু মুত্তালিবকে বয়কট করা হলো। তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক, বিয়ে, বেচাকেনা সব বন্ধ করে দেয়া হবে। এই অঙ্গীকারনামা কাবা ঘরের ভেতরে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত আবু তালিব অপারগ হয়ে রাসূল সা: সহ বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের সমস্ত মুসলিম এবং অমুসলিম, নারী পুরুষ ও শিশুসহ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে গিরি দুর্গ শিবে আবু তালিব এর মধ্যে আশ্রয় নেন।

শিবে আবু তালিব এর বন্দী দশা :

বন্দী জীবনের তিন বছর অনেক বেশি কঠিন ছিল। ক্ষুধা নিবারণের জন্য সাহাবীদেরকে গাছের পাতা পর্যন্ত খেতে হয়েছে। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা: বলেন ক্ষুধার জ্বালায় বন্দী বেশ এক রাতে একটি শুকনো চামড়া আগুনে ঝলসিয়ে চূর্ণ করে পানিতে গুলে পান করেছিলেন। এই তিন বছরে তাদের মধ্যে শিশু পুত্র কন্যা বন্দী অবস্থায় অনেকেই মৃত্যুবরণ করেন। ছোট শিশুরা যখন ক্ষুধা পিপাসায় অস্থির হয়ে গগন বিদারী চিৎকার করত তখন তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত।

বন্দী দশা থেকে মুক্তি :

তাদের এই অবস্থা দেখে কিছু ব্যক্তি তাদের হয়ে আলোচনা করতে যায়। আবু জাহেল সাবধান করে দেয় তারা যেন মুহাম্মদের হয়ে কথা না বলে। তখনই আবু তালিব সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'আমার ভাতিজা আমাকে এক পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছে। তিনি বলেছেন, আপনাদের ওই অন্যায় চুক্তিনামা পোকা-মাকড়ে খেয়ে ফেলেছে; চুক্তির কোনো দফাই আর সেখানে উল্লেখ নেই, একমাত্র আল্লাহ নামটি ছাড়া। আপনারা খবর নিয়ে দেখুন। যদি আমার ভাতিজার কথা সত্যি হয়, তাহলে এ অন্যায় বয়কটের এখানেই শেষ হবে। আর এর অন্যথা দেখা গেলে আমাদের কোনো কথা নেই। তারা গিয়ে দেখল অঙ্গীকারনামায় শুধু বিসমিকা আল্লাহুম্মা কথাটি ছাড়া আর কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া- রাসুল এর অনন্য মুজিযা :

কুরাইশরা রাসু্ূল কে নবুওয়াতের নিদর্শন দেখানোর জন্য বারবার চাপ দিচ্ছিল। কুরআন তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তবুও তারা কুরআনকে যথেষ্ট মনে করল না। আল্লাহ জীবরীল আ: মাধ্যমে রাসূল ﷺ এর কাছে সংবাদ পাঠালেন- যদি তারা নিদর্শন দেখতে চায় তবে আমরা তাদের জন্য চাঁদকে দুই ভাগ করে দেব। রাসূল ﷺ কাফিরদের তা জানালেন। রাতের বেলা কাফিররা সবাই একত্রে জড়ো হলো। তারা সবাই তাদের চোখের সামনে দেখল- চাঁদ দুই ভাগ হয়ে আবার জোড়া লেগে গেল। এটা ছিল একটা অদ্বিতীয় ও অলৌকিক ঘটনা। বুখারী, মুসলিম এবং কুরআনে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ বলেন- কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরায়ত জাদু। (সূরা আল কামার, ১-২)

এই দৃশ্য দেখে কুরাইশরা বলতে লাগলো মুহাম্মদ সা: যাদু করেছে। এই দৃশ্য নবীজির অন্যতম মুজিযা।

বড় বড় সাহাবাগণের ইসলাম গ্রহণ

মক্কাভূমি মুসলিমদের আর্তচিৎকারে ভারী হয়ে উঠেছিল। সব সময় মক্কার আকাশে অত্যাচারের কালো মেঘ ছেয়ে থাকতো। সে কালো মেঘের মাঝে হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চমক দেখা গেলো। প্রাণসঞ্চার হলো মাজলুমদের দেহে। খুশির জোয়ারে ভরে উঠলো তাদের অঙ্গন। এর কারণ হলো, বড় বড় সাহাবাগণের ইসলাম গ্রহণ।যেমন;

হামযা রাযি. এর ইসলাম গ্রহণ:

একদিন আবু জাহেল সাফা পর্বতের পাদদেশে রাসূল ﷺ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে রাসূল ﷺ এর সাথে কটু বাক্য ব্যবহার করলো। এমনকি একটি পাথর উঠিয়ে তাঁর মাথা মোবারকে আঘাত করলো। ফলে তাঁর মাথা থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছিলো। তারপর আবু জাহেল কুরাইশদের বৈঠকে গিয়ে মিলিত হলো।

আব্দুল্লাহ ইবনে জাদআনের দাসী এসব দেখছিলো। সে হামযা রাযি. কে শিকার থেকে ফিরে আসতে দেখে তাঁকে এ পুরো ঘটনা জানালো। তা শোনামাত্র হামযা রাযি. ক্ষোভে

ফেটে পড়লেন। সামান্য মুহূর্তও বিলম্ব না করে তিনি আবু জাহেলের সন্ধানে ছুটে চললেন। আজ যেখানেই আবু জাহেলকে পাবেন; তার ভূত ছাড়িয়েই তবে ক্ষান্ত হবেন। অবশেষে হারাম শরীফের প্রাঙ্গণে তার দেখা মিললো। হামযা বললেন, হে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু নিঃসরণকারী! তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ কে গালি দিয়েছো! এবং তাঁকে পাথর দিয়ে আঘাত করেছো! অথচ আমি তাঁর দ্বীনই আছি। এরপর তিনি ধনুক দিয়ে তার মাথার উপর এমনভাবে আঘাত করলেন; ফলে সে আহত হয়ে পড়লো।

এদিকে এ হামলার কারণে আবু জাহেলের বনু মাখজুম ও হামযা রাযি. এর পক্ষে বনু হাশিম একে অপরের প্রতি মারমুখী হয়ে উঠলো। কিন্তু আবু জাহেল এভাবে সকলকে নিরস্ত করলো যে, আবু উমারাহকে যেতে দাও! আমি আসলেই তার ভাতিজাকে গালি দিয়েছি এবং আঘাত করেছি।

প্রথমদিকে হামযার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল আপন ভাতিজার প্রতি আবেগের কারণে; কেননা কাফেররা তাঁকে কষ্ট দিতো, এটা চাচার পক্ষে মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর প্রতি অত্যাচার কমে আসবে, এ ভেবে ইসলাম কবুল করলেন। পরে আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে ইসলামপ্রীতি জাগিয়ে দিলেন। ফলে তিনি ইসলামের রজ্জুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলিমদের শক্তি ও সম্মান উভয়ই বৃদ্ধি পেলো।

উমার ইবনুল খাত্তাব রাঃ এর ইসলাম গ্রহণ:

নবুয়্যতের ৬ষ্ঠ বর্ষে হামজা রাঃ এর ইসলাম গ্রহণের মাত্র ৩ দিন পর উমার ইবনুল খাত্তাব রাঃ ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে তিনি বর্ণনা মতে, উমার রাঃ আবিসিনিয়ার ১ম ও ২য় হিজরতের মধ্যবর্তী সময়ে নবুয়্যতের ৭ম বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করেন। অবশ্য, অপর বর্ণনামতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নবুয়্যতের ৫ম বর্ষে। অধিকাংশ শক্তিশালী মত, নবুয়্যতের ৬ষ্ঠ বর্ষেই উমার রাঃ ইসলাম গ্রহণ করেন আর ইবনে হিশামও এই মতকেই সমর্থন করেছেন।

উমার রাঃ এর ইসলাম গ্রহণ মূলত রাসূল সাঃ এর দু'আর ফসল। রাসূল সাঃ আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন এই বলে-

“হে আল্লাহ! উমার ইবনুল খাত্তাব অথবা আমর ইবনে হিশাম এর মধ্যে হতে যে তোমার নিকট অধিক প্রিয় তার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দাও!”

হাদিসটি মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযীতে এসেছে এবং তিরমিযী মতে হাদিসটি হাসান সহীহ। এই দু'আ কবুলের পর রাসূল সাঃ ওই মারকাজ জানতে পারলেন যে, আবু জাহেল ঈমান আনবে না। তখন তিনি নির্দিষ্টভাবে শুধু উমার রাঃ এর জন্যই দু'আ করলেন এই বলে-

"আয় আল্লাহ! বিশেষভাবে উমারের মাধ্যমে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি কর!"

ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে উমার রাঃ এর ইসলাম বিদ্বেষীর মাত্রা বুঝার জন্য এই একটি ঘটনাই যথেষ্ট।

এক রাতে উমর রাযি. হারামে আগমন করেন। কা'বার পর্দার ভেতরে প্রবেশ করে লুকিয়ে থাকেন। রাসূল ﷺ তখন নামাজে সূরা আল-হাক্কাহ তিলাওয়াত করছিলেন। উমর রাযি. তিলাওয়াত শ্রবণ করে মুগ্ধ ও হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি তখন মনে মনে বললেন, কুরাইশরা যেমন বলে থাকে, ইনি তো একজন কবি। তখন রাসূল ﷺ পাঠ করলেন—

"নিশ্চয় এটি এক মহাসম্মানিত বার্তাবাহকের বাণী। তা কোনো কবির কথা নয়। কিন্তু তোমরা অল্পই ঈমান আনো।"(সূরা আল-হাক্কাহ: ৪০-৪১)

উমর রাযি. তখন মনে মনে বললেন, আরে এ তো আমার মনের কথা। তিনি তা কী করে জানলেন! তখন তার মনের ভেতর ভালোবাসা হলো, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ একজন নবী। এর পরপরই রাসূল ﷺ তিলাওয়াত করলেন—

এবং এটা কোনো গণকের কথা নয়; কিন্তু তোমরা অল্পই শিক্ষা গ্রহণ করো। এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ।"(সূরা আল-হাক্কাহ: ৪২-৪৩)

রাসূল ﷺ নামাজে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়লেন। উমর রাযি.ও এর পুরোটাই শ্রবণ করলেন। এ সম্পর্কে উমর রাযি. বলেন, সে সময়ে ইসলাম আমার অন্তরজুড়ে স্থান করে নেয়। কিন্তু নিজের পূর্বপুরুষদের ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের কারণে তার পক্ষে ইসলাম গ্রহণ বিলম্ব হয়ে যায়।

তার কঠোরতার কারণে তিনি রাসূল ﷺ ও মুসলিমদের জন্য ছিলেন অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তি। এমনকি একদিন তিনি খোলা তরবারি হাতে মুহাম্মাদ ﷺ কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন। পথে নাঈম ইবনে আব্দাহ্লাহ নামক এক আনসারির সাথে দেখা হলো, সে জিজ্ঞেস করলো, হে উমর! কী উদ্দেশ্যে কোথায় যাচ্ছো? উমর রাযি. তখন বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। নাঈম ইবনে আব্দুল্লাহ বললো, তোকে হত্যা করা বনু হাশিম ও বনু যুহরা থেকে কীভাবে রক্ষা

পাবে? উমর রাযি. বললেন, মনে হয় তোমারও পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ বেদ্বীন হয়ে গেছো!তারপর নাঈদ ইবনে আব্দুল্লাহ তাকে বললো, তোমাকে এক আশ্চর্যের কথা বলি— তোমার বোন ও ভগ্নিপতি তোমাদের ধর্ম ছেড়ে বেদ্বীন হয়ে গেছে! এ কথা শুনে তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে সোজা ভগ্নিপতির বাড়ির দিকে ছুটলেন।

সেখানে ঘরের ভেতর খাব্বাব রাযি. তাঁদেরকে তা'লীম দিচ্ছিলেন। উমর রাযি. এর আগমনের আওয়াজ শুনে তিনি আত্মগোপন করেন। কিন্তু উমর ঘরের কাছাকাছি পৌঁছামাত্র খাব্বাবের মৃদু কণ্ঠস্বর শুনছিলেন। তিনি এসে বললেন, কার মুখে আওয়াজ শুনলাম? তাঁরা বললেন, আমরা নিচু গলায় কথা বলছিলাম। উমর বললেন, সম্ভবত তোমরা বেদ্বীন হয়ে গেছো? ভগ্নিপতি সাঈদ বললেন, তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করে ভগ্নিপতির ধর্ম যদি সত্য থাকে, তবে করণীয় কী? এ কথা শোনার পর তিনি ভগ্নিপতিকে নিম্নভাবে প্রহার করতে শুরু করলেন। উমরের বোন তাঁকে স্বামীর কাছ থেকে জোর করে আলাদা করে নিলেন। উমর প্রচণ্ড রেগে তাঁকে চড় মারলেন, ফলে তাঁর মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেল। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, তিনি মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাঁর বোন রাগ ও অবস্থার সঙ্গে বললেন, উমর যদি তোমার দ্বীন ছাড়া অন্য ধর্ম সত্য থাকে। এ কথা বলে তিনি কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। শাহাদাতের এ বাণী শোনামাত্র উমর রাযি. এর মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হয়। নিজ বোনের রক্তাক্ত মুখমণ্ডল দেখে তিনি লজ্জিত হলেন। তারপর বোনকে দরদের সাথে বললেন, তোমাদের নিকট যে কিতাব আছে; তা দাও না, দেখি।

তাঁরা বললেন, অপবিত্র অবস্থায় তা স্পর্শ করা যাবে না। তাই তিনি গোসল করে আসলেন। তারপর সহীফাখানা পড়তে থাকলেন। এভাবে তিনি সূরা ত্বহা পাঠ করলেন।তারপর বললেন, এ তো বড় পবিত্র কথা! খাব্বাব রাযি. তখন গোপন অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, উমর সন্তুষ্ট হয়ে যাও। বিগত বৃহস্পতিবার রাসূল ﷺ তোমার জন্য দুআ করেছেন। তা কবুল হয়েছে। তারপর তিনি রাসূলের অবস্থান জানতে চাইলেন। উমর রাযি. তরবারি কোষবদ্ধ করে সাফা পাহাড়ে এসে দারুল আরকামে উপস্থিত হলেন।

তিনি এসে দরজায় করাঘাত করলেন। তখন দরজার ফাঁক দিয়ে একজন উমর রাযি. কে দেখলেন। সাথে সাথে তা রাসূল ﷺ কে জানানো হলো। সকলেই তখন সংঘবদ্ধ হয়ে গেলেন। হামযা রাযি. বললেন, কী হয়েছে? বিষয়টা জানার পর তিনি বললেন,

যদি সে সদিচ্ছা নিয়ে আগমন করে; তবে আমাদের কাছে সদিচ্ছার অভাব হবে না। আর যদি তাঁর অন্য উদ্দেশ্য থাকে; তবে তাঁর তরবারি দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হবে। রাসূল ﷺ এর কাছে তখন ওহী নাযিল হচ্ছিলো। ওহী নাযিল শেষে তিনি বৈঠক ঘরে আসলেন। উমরের জামা ও তরবারির কোষ ধরে শক্তভাবে টান দিয়ে বললেন, উমর! যেমনটি ওয়ালিদ ইবনে মুগীরাহ’র উপর অবতীর্ণ হয়েছিল; সেই রূপ লাঞ্ছনা আসার আগে কি তুমি পাপাচার থেকে বিরত হবে না? রাসূল ﷺ তখন তাঁর জন্য দুআ করলেন। তাঁর দুআর পর উমর রাযি. এর অন্তরে স্পন্দনের সৃষ্টি হলো। তিনি সাথে সাথে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে ইসলাম কবুল করে নিলেন। তখন মুসলিমগণ এত জোরে তাকবীর দিলেন যে, তা মাসজিদে হারামে অবস্থানকারীরাও শুনতে পায়।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, ইসলাম কবুলের পর উমর রাযি. তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে আবু জাহেল কে চিহ্নিত করলেন। তার ঘরে তিনি করাঘাত করলেন। সে উমর রাযি. কে আন্তরিকতা সাথে অভ্যর্থনা জানালো। উমর জাহেল তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা তাকে জানিয়ে দিলেন। আবু জাহেল তাঁর জন্য বদদু’আ করে দরজা বন্ধ করে দিলো। ১০০ এভাবে তিনি নিজ মামা আসী ইবনে হাশিমের নিকটে গিয়েও তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা বলে এলেন। ১২ তারপর তিনি এমন একজনকে খুঁজলেন, যে ব্যক্তি কোনো খবর জোরেশোরে প্রচার করতে পারে। এ কাজে জামীল ইবনে মা’মার জুমাহীর কথা শুনে তার কাছে গিয়ে ওমর রাযি. তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা প্রচার করতে বলেন। সে প্রচার করতে শুরু করে, ওমর বেদ্বীন হয়ে গেছে। ওমর রাযি. তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, এ মিথ্যা বলছে; বরং আমি মুসলিম হয়েছি। এরপর লোকজন তাঁর উপর চড়াও হয়। একপক্ষে জনতা অপরপক্ষে একা ওমর রাযি.। এভাবে সূর্য প্রায় মাথার উপর উঠা পর্যন্ত লড়াই চলতে লাগলো। ওমর রাযি. ক্লান্ত হয়ে বসে গেলেন। লোকজন তখনও তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো। তিনি বললেন, তোমরা যা খুশি করো। আমরা যদি তিনশ’ হতাম! তবে মক্কায় তোমরা থাকতে, না আমরা থাকতাম তা দেখে নিতাম।তারপর তারা ওমর রাযি. এর বাড়ি আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে।

ওমর তখন ঘরে বসে আছেন। এ অবস্থায় তাঁদের মিত্র সাহম গোত্রের আবু আমর আস ইবনে ওয়ায়িল এসে তাঁর কাছে ঘটনা জানতে চায়। ওদিকে সমগ্র উপত্যকা তখন লোকে লোকারণ্য। আস তাদের কাছে গিয়ে তাদের ইচ্ছা জানতে চায়। অতঃপর তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

ইবনে আব্বাস রাযি. একবার তাঁর কাছে জানতে চান, তাঁর খেতাব কীভাবে ফারুক হলো? তখন তিনি বললেন, যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। রাসুল ﷺ এর কাছে আরজ করলাম, গোপনীয়তার কী দরকার? সে সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমরা অবশ্যই গোপনীয়তা পরিহার করবো। তারপর আমরা দু'টি সারিতে রাসুল ﷺ কে বেষ্টন করে বাহিরে এলাম ও মাসজিদে হারামে প্রবেশ করলাম। একটি সারির পুরো ভাগে আমি। অন্য সারির পুরো ভাগে হামযা রাযি.। আমাকে ও হামযা রাযি. কে মুসলিমদের মাঝে দেখে কুরাইশদের মন এমনভাবে ভাঙলো যে, আগে কখনো এমন হয়নি। সেদিন রাসুল ﷺ আমার উপাধি দিয়েছিলেন ফারুক।

শোকের বছর

আবু তালিবের মৃত্যু:

আবু তালিবের মৃত্যু নিয়ে সীরাহবিদদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ আছে। গিরি সংকট থেকে ফিরে এসে আবু তালিবের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। বয়কট থেকে মুক্তির ৬ মাস পর নবুয়তের দশম বর্ষে তিনি ইন্তেকাল করেন।

আবু তালিবের মৃত্যুশয্যায় রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, "চাচাজান! আপনি শুধু একবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমাটি পাঠ করুন, যাতে আমি বিচার দিবসে আপনার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারি।" আবু তালিবের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল কুরাইশ নেতৃবৃন্দ। তাদের মধ্যে আবু জাহল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়া বলল, "আবু তালিব! আপনি কি তাহলে শেষ পর্যন্ত আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে যাবেন?" এরপর আবু তালিব যাতে কালিমা পড়তে না পারেন এজন্য তারা ক্রমাগত আবু তালিবের সাথে কথা বলতে থাকেন। অবশেষে আবু তালিব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মৃত্যুর আগে শেষ যে বাক্যটি তিনি বলেন তা ছিল- "আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর।"

আবু তালিবের চার সন্তান ছিল তালিব, আকিল, জাফর রা: ও আলী রা:।

রাসূল ﷺ এর চাচা ও ফুফু:

আব্দুল মুত্তালিবের ১০ পুত্রসন্তান এবং ৬ জন কন্যাসন্তান ছিল। পুত্রসন্তানগণ হল-

হারিস (একাই এক মা থেকে)
যুবায়ের, আব্দুল্লাহ ও আবু তালিব (একই মা থেকে)
আব্বাস ও দিরার (একই মা থেকে)
হামযা, মুকাওয়াম ও হিয়াল (একই মা থেকে)
আবু লাহাব (একাই এক মা থেকে)
কন্যাসন্তানগণ হল-
সাফিয়্যাহ
আতিকাহ
উম্মে হাকিম
উমায়মা (যয়নাব বিনতে জাহাশ এর মা)
আরওয়া
বাররাহ
এই ১০ জন পুত্রসন্তানের মধ্যে ৬ জন রাসূল এর নবুওয়াত লাভের পূর্বেই মারা যান। বাকি ৪ জন হলেন- হামজা, আব্বাস রা: ও আবু তালিব, আবু লাহাব। এই ৪ জনের মধ্যে হামজা ও আব্বাস ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবু তালিব ও আবু লাহাবের ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়নি। এখানে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য, হামযা ও আব্বাস- উভয় শব্দের অর্থই 'সিংহ'। আবার আবু তালিবের আসল নাম ছিল 'আব্দে মানাফ' এবং আবু লাহাবের আসল নাম ছিল 'আব্দুল উযযা'। মানাফ ও উযযা ছিল কুরাইশদের দুটি দেবীর নাম।
নবীজীর ৬ জন ফুফুর মধ্যে নিশ্চিতভাবে ইসলাম গ্রহণের কথা জানা যায় সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব রা: এর। বাকি চারজনের বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায় না।

খাদিজা রাযি.এর ইন্তেকাল:
খাদিজা রা: নবুয়তের দশম বর্ষের রমাদান মাসের ১০ তারিখে ইন্তেকাল করেন। মাস নিয়ে তেমন কোনো মতভেদ নেই। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর মতভেদে ৫০ কিংবা ৫৫ বছর। আবু তালিব এবং খাদিজা রা: এর মৃত্যুর পর কুরাইশদের অত্যাচার আগের চেয়েও অনেক গুণ বেড়ে যায়। একদিন রাসূল ﷺ রাস্তা দিয়ে হাটার সময় এক জন কুরাইশ কাফির এসে তার মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে। সেই অবস্থাতেই তিনি ঘরে ফিরে আসেন। তার মেয়ে তার এই অবস্থা দেখে কান্না করতে থাকেন তখন

রসূল তাকে উত্তর দেন মেয়ে আমার। তুমি কেঁদো না। আল্লাহই তোমার পিতার হেফাজতকারী। তিনি আরো বলেন যতদিন আমার চাচা আবু তালিব জীবিত ছিলেন ততদিন আমার সাথে এত খারাপ ব্যবহার করেনি যা আমার সহ্যের বাহিরে ছিল।
সীরাহ বিশেষজ্ঞদের মতে এই বছর একের পর এক দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে যাওয়ার কারণে এই বছরটির নাম হয় আমুল হুযন বা দুঃখের বা শোকের বছর। আবু তালিবের কারণে ঘরের বাইরে তিনি নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন আর ঘরের ভেতর প্রশান্তি লাভ করতেন খাদিজা রা এর কারণে।

সাওদা বিনতে যাম'আহ রাঃ এর সাথে রাসূল সাঃ এর বিবাহঃ
নবুওয়াতের ১০ম বর্ষের শাওয়াল মাসে রাসূল সাঃ বিবাহ করেন সাওদা বিনতে যাম'আহকে। তিনি প্রাথমিক যুগের মুসলিম ছিলেন এবং আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতের সাথী ছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম ছিল সাকরান বিন 'আমর। তিনিও প্রথম পর্যায়ের মুসলিম ছিলেন এবং আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। আবিসিনিয়ায় তাঁর মৃত্যু হলে সাওদা রাঃ এর ইদ্দত পালন শেষে রাসূল সাঃ তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান এবং বিয়ে সম্পন্ন হয়। তিনি ছিলেন রাসূল সাঃ এর দ্বিতীয় স্ত্রী।

তায়েফ যাত্রা ও অবর্ণনীয় কষ্টের মুখোমুখি

তায়েফ যাত্রা:
মক্কা কুরাইশরা যখন ব্যাপকভাবে রাসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল এবং নানাবিধ অত্যাচার-নির্যাতনে রাসূল ও মুসলিমদের জর্জরিত করে ফেলল তখন রাসূল এক বৃক্ষ আশ্রয় নিয়ে নরওয়াহের ১০ম বছরের শাওয়াল মাসে মক্কা থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত তায়েফে গমন করলেন। তার আশা ছিল তায়েফের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে এবং তার সাহায্যকারী হবে।
এই আশায় তিনি তার মুক্ত করা ক্রীতদাস যায়েদ বিন হারিসা রাঃ কে সাথে নিয়ে পায়ে হেঁটে তায়েফে গিয়েছিলেন। তায়েফে গিয়ে তাঁকে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়। তায়েফের মানুষ তো ইসলাম কবুল করলই না; বরং তায়েফের ছোট-বড়, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রত্যেকেই তাঁর সাথে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক আচরণ

করল। তায়েফের সর্দার ছিলেন বনু সাক্বীফ গোত্রের ৩ নেতা। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে রাসূল তাদের প্রত্যেককে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বললেন। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল। তাদের একজন বললেন, "সে (মুহাম্মাদ সাঃ) কাবার পর্দা ছিঁড়ে দেখাও যদি আল্লাহ তাকে প্রেরণ করে থাকেন"। দ্বিতীয় জন বললেন- "আল্লাহ যদি তোমাকে নবী করেই পাঠাতেন, তাহলে আমি কাবার পর্দা ছিঁড়ে ফেলতাম"। অন্য ব্যক্তি বললেন- "তুমি যদি নবীই হতে, তাহলে কি এমন জুতা চটর চটর করে পায়ে হেঁটে বেড়াতে?"তৃতীয়জন বলল, "নবী করার জন্য আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পাননি!" চতুর্থ জন বলল, "তোমার সাথে আমি কোন কথাই বলব না। প্রকৃতই যদি তুমি নবী হও, তবে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করা আমার জন্য বিপজ্জনক আর যদি তুমি আল্লাহর নামে মিথ্যা প্রচারে লিপ্ত হও, তবে তোমার সাথে কথা বলা আমার সঠিক নয়"। তাদের একথাবার্তায় ও আচরণে রাসূল ﷺ এর অত্যন্ত মনোক্ষুণ্ণ হলো এবং সেখান থেকে যাবার সময় তাদেরকে বললেন, "তোমরা যা করলে এবং বললে তা গোপনে রাখ"। তিনি চাননি যে সাক্বীফের এই সর্দাররা রাসূল সাঃ এর দাওয়াতের কথা কুরাইশদের কাছে বলুক। কারণ, এতে মক্কায় ফিরে গেলে কুরাইশদের পক্ষ থেকে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা ছিল। সাক্বীফের এই নেতারা রাসূল সাঃ এর এই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।

তায়েফের অন্য ব্যক্তিদের দাওয়াত:

রাসূল সাঃ তায়েফে দশ দিন অবস্থান করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রত্যেককে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা সকলেই সেই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে তায়েফ থেকে চলে যেতে বলল। এরপর তিনি সাধারণ মানুষদেরকে দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারাও তাঁর দাওয়াত অস্বীকার করল। ফলে ভগ্নহৃদয়ে তিনি মক্কায় ফিরে আসার প্রস্তুতি নিলেন। ফেরার পথে তাঁকে উত্যক্ত, অপমানিত ও কষ্ট দেওয়ার জন্য শিশু-কিশোর, যুবকদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হলো। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, যখন তায়েফের কিছু সাধারণ মানুষ ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠলেন তখন তায়েফের নেতারা শঙ্কিত হয়ে রাসূল সাঃ কে বিতাড়নের জন্য বেয়াদব কিশোর-যুবকদের লেলিয়ে দিলেন। পথের দু'পাশে তারা হাত তালি দিয়ে অশ্লীল কথাবার্তা বলতে থাকল এবং তাকে গালমন্দ দিতে ও পাথর দ্বারা আঘাত করতে থাকল। আঘাত এর ফলে রাসূলের পায়ের গোড়ালিতে ক্ষত সৃষ্টি হল এবং রক্ত জমাট বেঁধে পায়ের

জুতো পায়ের সাথে আটকে গেল। পথ চলা কালে এই অবস্থায় যায়েদ বিন হারিসা রাসূলকে রক্ষার জন্য ঢালের মত কাজ করছিলেন। ফলে মাথার কয়েকটি স্থানে তিনিও আঘাত পেলেন। এভাবে পথ চলতে চলতে ক্লান্ত, অবসন্ন এবং বিধ্বস্ত অবস্থায় তিনি এক আঙ্গুরের বাগানে আশ্রয় নিলেন। এই বাগানটি ছিল তায়েফ এর এক থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত এবং এর মালিক ছিল উতবা ইবনে রাবিয়াহ ও শায়বা ইবনে রাবিয়াহ। তিনি বাগানে প্রবেশ করলে নিকৃষ্ট তায়েফবাসীরা ঘরে ফিরে গেল।

তায়েফবাসীর জন্য নবিজির দু’আ:
বাগানে প্রবেশ করে রাসূল সাঃ আশ্রয় গ্রহণে হায়ান দিয়ে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর রাসূল আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করলেন। তাঁর এই দোয়া ‘দুর্বলের দোআ’ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি দোয়া করলেন এই বলে-
"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার শক্তির দুর্বলতা, অসহায়ত্ব আর মানুষের নিকট স্বীয় মূল্যহীনতার অভিযোগ প্রকাশ করছি। ওহে দয়াময় দয়ালু, তুমি দুর্বলদের প্রতিপালক, তুমি আমারও প্রতিপালক, তুমি আমাকে কার নিকট অর্পণ করেছ, যে আমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করবে, নাকি তুমি আমাকে এমন শত্রুর নিকট ন্যস্ত করেছ যাকে তুমি আমার যাবতীয় বিষয়ের মালিক করেছ। যদি তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হও তবে আমার কোন আফসোস নেই, তবে তোমার ক্ষমা আমার জন্য সম্প্রসারিত করো। আমি তোমার সেই নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদ্দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত হয়ে চতুর্দিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয়াদি তোমার উপর ন্যস্ত। তুমি আমাকে অভিসম্পাত করবে কিংবা ধমক দিবে, তার থেকে তোমার সন্তুষ্টি আমার কাম্য। তোমার শক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন শক্তি নেই।"
এই দোয়াটি থেকেই বুঝা যায়, তায়েফবাসী রাসূল সাঃ এর সাথে কতটা দুর্ব্যবহার করেছিল এবং তাদের ঈমান না আনার কারণে তিনি কতটা ব্যথিত হয়েছিলেন।

ইসরা ও মিরাজের ঘটনাবলী

ইসরা ও মিরাজের পরিচয়:

নবুওয়াতের দশম বছরে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে তিনি তার চাচা ও প্রাণ প্রিয় স্ত্রীকে হারান। মানসিকভাবে তিনি অনেক বেশি কষ্টে ছিলেন। নির্যাতন ও লাঞ্ছনা শিকার করেন হলেন তায়েফবাসীর কাছে। এই বিপর্যস্ত মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় রাসুল ﷺ কে তার তার একান্ত সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়ে ধন্য করলেন। একমাত্র মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কোন নবী বা রাসুলের এই সৌভাগ্য হয়নি।

ইসরা :

ইসরা রাত্রিকালীন ভ্রমণ। আল্লাহর নির্দেশে রাসুল ﷺ জিবরাইল আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি বাহনের পিঠে বসে হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত যে নৈশকালীন ভ্রমণ করেছিলেন তাকে বলা হয় ইসরা।

মিরাজ :

মিরাজ অর্থ উপরে আরোহণের মাধ্যম বা সিড়ি। আল্লাহ তার প্রিয় হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আকাশে আরোহণ করিয়ে প্রথম আকাশ থেকে শুরু করে সপ্তমাকাশ ভেদ করে সিদরাতুল মুনতাহা পেরিয়ে তার নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন। একেই মিরাজ বলে।

ইসরা ও মিরাজ এর সময়কাল :

ইসরা ও মিরাজের সময়কাল নিয়ে সীরাহবিদগণের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ আছে। নবুয়ত লাভের বছর থেকে পঞ্চম বছর, অষ্টম বছর, দশম বছর বিভিন্ন মত আছে। এমনকি মাস নিয়েও বিভিন্ন মতভেদ আছে।

ইসরা’র ঘটনা :

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা শরীফের হিজর বা হাতীমে শোয়া ছিলেন। তার সাথে আরও দু’জন শোয়া ছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় তাদের নাম এসেছে, হামযাহ ও জা’ফার (তবে জা’ফার এর বর্ণনাটি ঠিক নয় কারণ সেসময় জা’ফার আবিসিনিয়ায় অবস্থান করছিলেন)। এমতাবস্থায় তিন ফেরেশতা এসে বললেন,

এদের মধ্যে কোনটি সে লোক? একজন বলল, মাঝখানে যিনি শুয়ে আছেন তিনি। তারপর তারা চলে গেলেন। ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে- হাতীমে জিবরীল তাঁর বক্ষ বিদারণ করেন এবং যমযমে (ভিন্ন বর্ণনায়-ঈমানে) পরিপূর্ণ পাত্র নিয়ে এসে তাঁর হৃৎপিণ্ড ধৌত করে দেন। পরবর্তী দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের সালাত আদায় করে উম্মে হানি (রাসুল এর চাচাতো বোন ও আবু তালিবের কন্যা) এর ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। এমতাবস্থায় ঘরের ছাদ ভেদ করে ফেরেশতাগণ অবতরণ করলেন। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জমযমের কাছে নিয়ে গেলেন। তারপর তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। রাসুল সা: বর্ণনা করেন- এমন সময় হিকমত (জ্ঞান) ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের পেয়ালা আনয়ন করা হলো। আমার বক্ষ হতে পেট পর্যন্ত ফুঁড়ে জমযমের পানি দিয়ে হৃদপিণ্ড ধৌত করে তা ঈমান ও হিকমতের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দেয়া হলো।" কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, এই সময় তার দুই কাঁধের মধ্যস্থলে মোহরে নবুওয়াত স্থাপন করা হয়। যদি পূর্বেই তার কাঁধে মোহর স্থাপন করা থাকে করা হয়ে থাকে তবে এই দফা মূলত তার মোহরের নবায়ন করা হয়। আল্লাহই ভালো জানেন। রাসুল বলেন, "তারপর আমার নিকট খচ্চরের চেয়ে একটু ছোট এবং গাধার চেয়ে বড় একটি সাদা রঙের বুরাক নামক একটি বাহন আনয়ন করা হল।" তিনি প্রথমে বুরাকে আরোহণ করে মাসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত ভ্রমণ করলেন। এই বাহনটির গতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাসুল বলেছেন, "দিগন্তে যতদূর পর্যন্ত চোখ যায়, ততদূর পথ সে এক ধাপে অতিক্রম করে"। কোন কোন বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে জিবরাঈল একই বাহনে রাসুল এর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। তিনি নবীজির পিছনে উপবেশন করেন। শাদ্দাদ ইবনে আউস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসুল বলেছেন, মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত যাওয়ার সময় পথিমধ্যে এমন এক জায়গা অতিক্রম করে যাই যেখানে প্রচুর খেজুর গাছ ছিল। জিবরাঈল আমাকে বললেন, "এখানে নেমে সালাত আদায় করুন"। আমি সেখানে নেমে সালাত আদায় করি এরপর জিবরাঈল আমাকে বললেন, "আপনি কি জানেন আপনি কোথায় নামাজ পড়লেন?" আমি বললাম, "না, তা আমার জানা নেই"। তখন জিবরাঈল বললেন, "এটি ইয়াসরিব অর্থাৎ মদিনা যেখানে আপনি পরবর্তীতে হিজরত করে যাবেন"। এরপর আমরা সেখান থেকে রওনা হলাম।

পথিমধ্যে অপর একটি স্থানে জিবরাঈল পুনরায় আমাকে বললেন, "এখানেও নেমে সালাত পড়ুন"। আমি নেমে সালাত পড়লাম জিবরাঈল আমাকে বললেন, "আপনি সিনা

উপত্যকায় মুসা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সালাত পরলেন। এই গাছেই আল্লাহ তাঁর নূরের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন এবং মুসার সাথে কথা বলেছিলেন। আমরা আবার রওনা হলে পুনরায় এক স্থানে জিবরাঈল বললেন, "এখানে নেমে সালাত আদায় করুন"। আমি তার কথামতো সেখানে নেমে পড়ি এরপর জিবরাঈল বললেন, "এটি হচ্ছে মাদইয়ান শহর। এটি ছিল শু'আইব এর এলাকা"। এরপর সেখান থেকে রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ পর জিবরাঈল আবার আমাকে নেমে সালাত পড়তে বললেন। আমি এখানেও সালাত আদায় করলাম। এরপর জিবরাঈল বললেন, "এটি ঈসা জন্মস্থান- বায়তুল লাহাম(বেথেলহাম)"।
বাইহাকী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

মিরাজের ঘটনা:
তারপর তিনি জান্নাত থেকে প্রবাল ও পদ্মরাগ পাথরের তৈরি সিঁড়ির মাধ্যমে উর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ শুরু করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমরা দুনিয়ার আকাশের নিকটবর্তী হলাম। জিবরিল ফেরেশতা আমার সাথেই ছিলেন। উপর থেকে আগমনকারীর পরিচয় জানতে চেয়ে জিজ্ঞেস করা হলো, কে? উত্তরে জিবরিল বললেন, আমি জিবরিল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে লোকটি কে? তিনি বললেন, মোহাম্মদ। বলা হলো তাকে কি আসতে বলা হয়েছে? তিনি বললেন হ্যাঁ। আকাশের ফেরেশতাগণ বললেন, স্বাগতম, শুভ হোক তার আগমন। প্রথমে তিনি আদম আ: এর সাথে দেখা করে সালাম দেন। দ্বিতীয় আকাশে যাওয়ার সময় তাকে একই প্রশ্ন করা হয়। সেখানে তিনি ইয়াহিয়া এবং ঈসা আ: এর সাক্ষাৎ পান। চতুর্থ আকাশে গিয়ে ইদ্রিস আ:, পঞ্চম আকাশে হারুন আ:, ষষ্ঠ আকাশে মূসা আ: এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। এবং সপ্তম আকাশে গিয়ে ইব্রাহিম আ: এর সাথে সাক্ষাৎ হয়।
বায়তুল মা'মুর থেকে রাসূল কে আরও উপরে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হয়। 'সিদরাত' অর্থ হল 'কুল গাছ' আর 'মুনতাহা' অর্থ 'সর্বশেষ'। সিদরাতুল মুনতাহা অর্থ 'সর্বশেষ প্রান্তের কুলগাছ'। এটি এমন এক স্থান যে এর নীচ থেকে কোন বস্তু কেবল এই পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। অতঃপর এখান থেকে তা গ্রহণ করা হয়। এবং উপর হতেও কোন বস্তু এই পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর এখান থেকে তা গ্রহণ করা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আমার জন্যে সিদরাতুল মুনতাহা তথা সীমান্তের কুল বৃক্ষ উন্মুক্ত করা হল। এই বৃক্ষের ফলগুলো ছিল কলসীর ন্যায়

বড়। গাছের পাতাগুলো ছিল হাতির কানের মতো বৃহদাকার। অতঃপর সেই বৃক্ষকে স্বর্ণের প্রজাপতি, জ্যোতি ও বিভিন্ন বিচিত্র রঙ আচ্ছন্ন করে ফেলল। ফলে তা এমন রূপে পরিবর্তিত হল যে, কোন সৃষ্টির পক্ষেই তার সৌন্দর্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তিনি সিদরাতুল মুনতাহায় জিবরিল ফেরেশতাকে আসল আকৃতিতে দেখলেন। অথচ ইতঃপূর্বে তিনি আরেকবার দুনিয়াতে তাঁকে আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন।

সহিহ বুখারীর হাদিসে রয়েছে রাসূল সপ্তম আসমান পেরিয়ে সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়েছিলেন, আবার সহিহ মুসলিমের হাদিসে রয়েছে সিদরাতুল মুনতাহা অবস্থিত ষষ্ঠ আসমানে। ইমাম নববী এই দুটি সহিহ হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন এভাবে- সিদরাতুল মুনতাহা বৃক্ষের কান্ড শুরু হয়েছে আসমান থেকে কিন্তু এর বিস্তৃত হয়ে শেষ হয়েছে সপ্তম আসমানে। সিদরাতুল মুনতাহা হলো আসমানের শেষ সীমানা। এই সীমানা পর্যন্ত জিবরিল আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাওয়ার অনুমতি আছে। সেখান থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অলৌকিকভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরো উপরে আরশে আজিমে নিয়ে গেলেন। কোন কোন বর্ণনামতে সিফাতুল মুনতাহাতেই পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়। কিন্তু সহি বুখারীর হাদিসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট বলেছেন, এরপর আমাকে আরো উপরে নিয়ে যাওয়া হয়।

আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনটি হাদিয়া:

মুসলিম শরীফের হাদিসে রয়েছে, আল্লাহ এসময় রাসূল ﷺ কে তিনটি বিষয় হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেন-

১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত

২. সূরা বাকারার শেষ আয়াত গুলো অর্থাৎ শেষ আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু এবং

৩. রাসূলের উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে না আল্লাহ তার কবিরা গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। অর্থাৎ কবিরা গুনাহগার জাহান্নামী হবে তবে কাফির-মুশরিকদের মতো চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না বরং কবিরা গুনাহকারীর অনেকেই নবীদের সুপারিশে, কেউ আল্লাহর প্রিয় ফেরেশতাদের সুপারিশে কেউবা নিছক আল্লাহর মেহেরবানীতে ক্ষমা লাভ করবে।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্দিক উপাধি লাভ :

এরপর কাফেররা আবু বকর রা.-এর কাছে গিয়ে বলল, 'আপনি কি মুহাম্মাদের এমন উদ্ভট অবাস্তব কথা বিশ্বাস করবেন যে, তিনি এক রাতেই মসজিদূল আকসা পর্যন্ত গিয়েছেন এবং সকাল হওয়ার আগেই মক্কায় ফিরে এসেছেন?' আবু বকর রা. নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন, 'অবশ্যই বিশ্বাস করব। আমি তো এরচেয়ে অসম্ভব কথাও বিশ্বাস করি। আমি এ কথা মানি যে, সকাল-সন্ধ্যা মুহূর্তের মধ্যে তাঁর কাছে আকাশ থেকে ওহি আসে। সুতরাং এ ঘটনার ব্যাপারে কীভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারি?' এমন তাৎক্ষণিক ও দ্বিধামুক্ত সত্যায়নের কারণে আবু বকর রা.-এর উপাধি দেওয়া হয় 'সিদ্দিক' তথা মহা সত্যবাদী।

আয়েশা রাযি. এর সঙ্গে বিবাহ:

নবুওয়াতের একাদশ বর্ষের শাওয়াল মাসে রাসূল ﷺ এর সাথে আয়েশা রাযি. এর বিবাহ হয়। ঐ সময় আয়েশা রাযি. এর বয়স ছিলো ছয় বছর। হিজরতের প্রথম বছর শাওয়াল মাসে নয় বছর বয়সে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাযি. স্বামীর ঘরে পদার্পণ করেন।

আকাবার বাইআত সমূহ

দাওয়াত এর ভিন্ন পন্থা:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে ফিরে আসার পর নতুনভাবে দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন। তখন হজের মৌসুম ছিল, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাই আসতে শুরু করল। নবুয়তের চতুর্থ বৎসর থেকে নবীজি হজের সময় দাওয়াত দেন। কিন্তু দশম বছরে তিনি আরো প্রবল ভাবে দাওয়াত প্রচার করতে থাকেন। কারণ তিনি বুঝে গিয়েছিলেন মক্কায় থেকে ইসলাম প্রচারের এবং ইসলামী রাষ্ট্র গড়া সম্ভব না। তিনি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আলাদা ভূমির সন্ধান করছিলেন। তিনি বনু কিনদাহ, বনু কালব, বনু হানিফা এবং বনু আমির বিন সা'সা'আহ গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কুরাইশদের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে বাধা, অত্যাচার নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন রাসূল ﷺ ও তার সাহাবীরা। দাওয়াতী কাজ এর পাশাপাশি রাসূল

ﷺ নিরাপদ ভূমি এর খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আশ্রয় এর সন্ধান করছিলেন হন্য হয়ে। হজের মৌসুমে মিনায় খাজরাজের দল আসে। এবং তাদের মাধ্যমেই ইয়াসরীব এ ইসলাম ধর্মের সূচনা হয়।

আকাবার প্রথম বাইআত:

নবুওয়তের একাদশ বর্ষের হজের মৌসুমে ইয়াসরিবের ৬ জন যুবক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তারা রাসূল ﷺ কে কথা দিয়েছিলেন যে, ইয়াসরিবে ফিরে গিয়ে তারা ইসলাম প্রচার করবেন। পরবর্তী বছর অর্থাৎ নবুওয়তের দ্বাদশ বছরের হজের মৌসুমে ইয়াসরিব থেকে ১২ জন লোক (খাজরাজ থেকে ১০ জন আর আউস থেকে ২ জন) রাসূলের সাথে দেখা করতে আসেন। এদের মধ্যে পাঁচজন গত বছরেও এসেছিলেন। আর বাকি সাতজন ছিলেন নতুন। তারা হলেন:
১। মা'আব বিন হারিস (খাজরাজ)
২। যাকওয়ান বিন আবদুল কায়স (খাজরাজ)
৩। উবাদা বিন সামিত (খাজরাজ)
৪। ইয়াজিদ বিন সালামাহ (খাজরাজ)
৫। আব্বাস বিন উবাদাহ (খাজরাজ)
৬। আবুল হায়সাম বিন তাইয়্যাহান (আউস)
৭। উয়াইস বিন সাঈদাহ (আউস)
এই লোকগুলো মিনা-র আকাবা নামক স্থানে রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার প্রচারিত দ্বীনের ব্যাপারে কিছু কথা মেনে চলার অঙ্গীকার করেন। পরবর্তীতে ছয়জন যুবকের দ্বিতীয়বার আসা এবং মক্কা বিজয়ের সময় মহিলাদের নিকট থেকে নেয়া অঙ্গীকারনামায় এই কথাগুলো অত্যন্ত ছিল।
অঙ্গীকারনামায় কী কী অঙ্গীকার ছিল তা 'উবাদা বিন সামিত রা. সহীহ বুখারীর একটি বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘‘আমার সাথে এ কথার উপর অঙ্গীকার করো যে, আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার করবে না। চুরি করবে না, যেনা করবে না, নিজ সন্তানকে হত্যা করবে না, হাত-পায়ের মাঝে মনগড়া কোনো অপবাদ আনবে না এবং কোনো ভালো কথায় আমাকে অমান্য করবে না। যারা এসব কথা মান্য এবং পূর্ণ করবে, আল্লাহর নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে।

কিন্তু যারা এগুলোর মধ্যে কোনোটি করে বসে এবং তার শাস্তি এখানেই প্রদান করা হয়, তবে সেটি তার মুক্তিপত্রের কারণ হয়ে যাবে। আর যদি এগুলোর মধ্যে কোনো কিছু করে বসে থাকে এবং আল্লাহ তা গোপন রেখে দেন, তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হবে। চাইলে তিনি শাস্তি দেবেন অথবা ক্ষমা করে দিবেন।” এই বাই‘আতে জিহাদের ব্যাপারে কোনো অঙ্গীকার ছিল না। সাধারণত মহিলাগণ ইসলাম গ্রহণের সময় রাসূল ﷺ এর কাছে এসব বিষয়ের অঙ্গীকার করতেন। এজন্য এই বাই‘আতকে বলা হয় ‘বাই‘আতুন নিসা’ বা মহিলাদের বাই‘আত।হজ্জ সমাপ্ত হয়ে গেলে এই দলটির সাথে রাসূল ﷺ প্রথম মক্কা থেকে ধর্মপ্রচারক হিসেবে মুস‘আব বিন উমাইর রা. (কোনো কোনো বর্ণনায় আবু উমামা আস‘আদ বিন যুরারাহ রা. এর নামও এসেছে) প্রেরণ করেন। মুস‘আব বিন উমাইর ইয়াসরিবে গিয়ে আনসার বিন যুরারাহ রা. এর বাড়িতে নিলেন এবং তারা দুজনে মিলে প্রবল উদ্যমের সাথে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তাঁর এই ইসলাম প্রচার কাজের জন্য তার উপাধি দেয়া হয়- ‘মুকরিউন’ (উস্তাদ/শিক্ষক)।

আকাবার দ্বিতীয় বাইআত:

পরের বছর অর্থাৎ নবুয়তের ১৩তম বছর পুনরায় হজের মৌসুমে ইসরাঈলের ৪০০ জনের অধিক অমুসলিম এবং ৭০ জনের অধিক (প্রসিদ্ধ মতানুসারে ৭৫ জন) মুসলিম হাজ্ব পালনে উদ্দেশ্যে মক্কায় আসলেন এবং মুসলিমগণ রাসূল ﷺ এর সাথে গোপনে শপথ করলেন। কোন বর্ণনায় রয়েছে, মুস'আব বিন উমায়ের রা. তাঁদেরকে সাথে করে মক্কায় নিয়ে আসলেন। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হলো যে, ১২ই জিলহজ্জ তারিখে মিনার জামরাতে আকাবার নিকটে যে মুজদালিফাহ সেখানে তারা একত্রিত হবেন এবং সে সময়ে গোপনে রাতের অন্ধকারে হবে।

এই সমাবেশের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে কা'ব বিন মালিক রা. বলেন- “আমরা হজের জন্য বের হলাম। আইয়ামে তাশরীক এর মধ্যবর্তী দিবাগত রাতে রাসূলের সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত হলো এবং আমরা হাজ্ব থেকে ফারেগ হয়ে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলাম। আমাদের সাথে আমাদের অন্তরঙ্গ প্রত্যাশী নেতা আব্দুল্লাহ বিন হারাম উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন ইসলাম গ্রহণ করেননি। মুহাজিরগণের মধ্যে একজন তাঁকে রাসূল ﷺ এর সাথে নিয়েছিলেন। আমাদের সাথে আগত অন্যান্য মুহাজিরদের থেকে আমাদের কাজকর্ম কথাবার্তা গোপন রাখছিলাম। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারামের সাথে

আমাদের কথাবার্তা ঠিকই চলছিল। আমরা তাকে বললাম, “হে আবু জাবির! আপনি আমাদের একজন প্রভাবশালী ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নেতা। আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সূত্রে আমরা আপনাকে বর্তমান অবস্থা থেকে বের করে আনতে চাচ্ছি যাতে করে আপনি জাহান্নামের ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ইন্ধন না হয়ে যান। এরপর আমরা রাসূলের দাওয়াত দিলাম এবং বললাম যে, আজকের রাসূল সা. এর সাথে আমাদের সাক্ষাতের কথা আছে”। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং আমাদের সাথে আকাবায় গেলেন। তারপর তিনি আমাদের নেতা নির্বাচিত হলেন। আমরা এ রাতে যথারীতি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলো, তখন আমরা নিজ নিজ স্থান থেকে বের হয়ে রাসূলের সাথে সাক্ষাতের জন্য সেখানে নির্ধারিত স্থানে গেলাম। মোটামুটি পাঁচিশ জন পুরুষ এবং দুই জন মহিলা। মহিলা দুজনের একজন ছিলেন- উম্মে উমারা নুসাইবা বিনতে কা'ব এবং আরেকজন ছিলেন উম্মে মানি আসমা বিনতে আমর।

আমরা সকলে সূত্রে একত্রিত হয়ে রাসূল সা. এর কাছে আপেক্ষা করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত সেই আকাবায় মুহূর্ত এসে পড়ল এবং তিনি আসলেন। তাঁর সাথে আকাবা বিন আবদুল মুত্তালিব। যদিও তিনি তখনও আপন সম্প্রদায়ের ধর্মে উপরে ছিলেন। তবুও তিনি চাহিলেন ভাতিজার নিরাপত্তার জন্য উপস্থিত থাকতে। তিনি সর্বপ্রথম কথা বলা আরম্ভ করেন।

মদিনায় হিজরতের পটভূমি

সূরা জুমার এর ১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন হিজরতের ইঙ্গিত দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।

(সূরা জুমার, ৩৯:১০)

আকাবার দ্বিতীয় শপথের পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে ইয়াসরিব হিজরত করার অনুমতি দান করেন। এবং তার কিছুদিন পর

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরত করার অনুমতি দেন।

মদীনায় হিজরতকারী প্রথম সাহাবী হলেন আবু সালামা রা: এবং প্রথম সাহাবিয়াহ হলেন লায়লা বিনতে আবি হাসমা রা:। তিনি তার স্বামী আমির ইবনু রাবিয়া রা: এর সাথে হিজরত করেছিলেন।

সাহাবীরা যখন দলে দলে হিজরত করে মক্কা ছেড়ে চলে যেতে শুরু করলেন তখন মুশরিকদের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো। তারা চরম রকমের মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গেলেন। তারা বুঝতে পারছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তাদের শিরিক ধর্ম, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও মিথ্যা প্রতিপত্তি ধ্বংস হতে চলেছে।

মদীনায় হিজরতের প্রথম দল:

রাসূল ﷺ মুসলিমদেরকে এ নতুন দেশে হিজরত করার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। হিজরতের অর্থ হলো, সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশ, ধন-দৌলত ও সাহায্য-সম্পদ সবকিছু পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আল্লাহর রাস্তায় চলা। অধিকাংশ পথের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিপদাপদে ভরা।

মুসলিমগণ এসব বিষয় জেনেশুনে হিজরত শুরু করেন। মুশরিকরা সামনে তাদের বিপদ আছে বুঝতে পেরে, এখনই এ হিজরত ঠেকানোর জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করে। নিম্নে হিজরতের কয়েকটি নমুনা পাঠকগণের সামনে পেশ করা হলো—

০১. সর্বপ্রথম মুহাজির ছিলেন আবু সালামাহ রাযি। ইবনে ইসহাকের মতে তিনি আকাবার বড় শপথের আগেই হিজরত করেন। সাথে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। কিন্তু যখন তিনি যাত্রা করতে চাইলেন। তাঁর শ্বশুরপক্ষের লোকজন বললো, তোমার ব্যাপারে তুমি আমাদের উপর জয়ী হলে। তবে আমাদের মেয়েকে তোমার সাথে নিয়ে শহর ঘুরতে দিতে পারি না। এ বলে তারা আবু সালামাহ'র স্ত্রীকে নিয়ে গেলো। অপরদিকে এতে করে আবু সালামাহ'র আত্মীয়রা রাগান্বিত হয়ে বললো, তোমরা যখন এ মহিলাকে নিয়ে যাচ্ছো। তবে আমরাও আমাদের সন্তানকে তোমাদের সাথে যেতে দিতে পারি না। এ বলে তারা সন্তানটিকে নিয়ে টানাটানি শুরু করে; ফলে তার এক হাত ছুটে আসে। এমন সময় আবু সালামাহকে মদীনায় একাকীই যেতে হয়।

এরপর উম্মে সালামাহ'র এমন অবস্থা হয় যে, প্রত্যেক দিন তিনি আবতাহ। যেখানে এ বিষয়গুলো ঘটে, সেখানে আসতেন এবং সকাল পর্যন্ত কান্নাকাটি করতেন। এ অবস্থায় এক বছর অতিবাহিত হলো। তার এ অবস্থা দেখে এক আত্মীয়ের দয়া হলো,

বললো, কেন একে যেতে দিচ্ছো না? অথবা কেন তাঁকে তাঁর স্বামী ও সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছো?

এ কথার প্রেক্ষিতে আত্মীয়রা তাঁকে বললো, তুমি চাইলে যেতে পারো। তখন উম্মে সালামাহ তাঁর সন্তানকে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তানঈম গিয়ে পৌঁছলে উসমান ইবনে তালহার সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁকে আবু সালামাহ যে গ্রামে বাস করতেন সেখান পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

০২. সুহাইব ইবনে সিনান রুমী রাযি. রাসূল ﷺ এর পর হিজরত করেন।যখন তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন। কুরাইশরা তাঁর পথ রোধ করে। তারা বললো, তুমি আমাদের এখানে এসেছিলে দরিদ্র হিসেবে আর এখন তুমি নিজ সম্পদ নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে চাও? তিনি বললেন, যদি তোমাদেরকে এগুলো দিয়ে দেই; তবে কি আমাকে যেতে দেবে? তারা বলল, হ্যাঁ। তারপর তিনি নিজ ধন-সম্পদ তাদেরকে দিয়ে হিজরত করলেন। রাসূল ﷺ যখন এ সম্পর্কে জানতে পারলেন, তিনি বললেন— সুহাইব লাভবান হয়েছে, সুহাইব লাভবান হয়েছে।

০৩. উমর ইবনে খাত্তাব, আইয়াশ ইবনে আবী রবীয়াহ, হিশাম ইবনে আস ইবনে ওয়াইল রাযি. নিজেদের মধ্যে এটা স্থির করেন যে, তারা সারিফ ইবনে তানযুব স্থানে খুব সকালে একত্রিত হয়ে সেখান থেকে মদীনা হিজরত করবেন। পরে হিশাম বন্দী হয়ে যান।

উমর ও আইয়াশ রাযি. যখন মদীনার কূবাতে অবতরণ করেন তখন আইয়াশের ভাই আবু জাহেল ও হারিস এসে উপস্থিত হয়। তাঁকে না দেখা পর্যন্ত তার মা চলে আঁচড়াবে না ও রোদ ছেড়ে ছায়ায় আসবে না বলে মানত করেছিল। তাদের কথায় আইয়াশ রাযি. গলে যান এবং উমর রাযি. নিবেধ করা সত্ত্বেও তাদের সাথে রওয়ানা করেন। পথিমধ্যে তারা হীন কৌশলে আইয়াশকে বন্দী করে ফেললো।

পরবর্তীতে আল্লাহর রাসূলের আদেশে ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি. তাঁদের দু’জনকে বন্দীদশা থেকে ছাড়িয়ে আনেন।

মুশরিকদের শত বাধা সত্ত্বেও আকাবার শপথের পর মাত্র দু’মাসের মধ্যে রাসূল ﷺ, আবু বকর রাযি. ও আলী রাযি. ব্যতীত আর কেউ সাহাবী মক্কা অবস্থানরত ছিলেন না। তবে এমন কিছু সাহাবা অবশিষ্ট ছিলেন যাদেরকে মুশরিকরা আটকে রেখেছিলো। আবু বকর রাযি. ও মদীনায় হিজরতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে বললেন। যেন তারা দু’জন এক সাথে যেতে পারেন।

দারুন নান্দওয়াতে কুরাইশদের ঘোর চক্রান্ত:

মুশরিকদের মূর্তিপূজা, সামাজিক ঐক্যবদ্ধতা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সামনে হিজরত ছিলো এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। তারা জানতো মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ এর মধ্যে ক্ষীরকম নেতৃত্ব দেওয়ার শক্তি আছে। আর সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে তাঁকে অনুসরণ করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। তাঁরা যদি ইয়াসরিবের কর্তৃত্ব পেয়ে যায়; তবে তা হবে মূর্তিপূজকদের জন্য বিপজ্জনক ব্যাপার।

কারণ, ইয়ামান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত লোহিত সাগরের উপকূল দিয়ে তাদের ব্যবসায় জাতীয় সড়ক। তাদেরকে সব সময় এ পথকে নিরাপদ রাখতে হবে।

যদি মুসলিমগণ সেখানে ইসলামের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলে; তবে তাঁরা ইসলামের শক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে।

আকাবার দ্বিতীয় শপথের আনুমানিক আড়াই মাস পর নবুয়্যাতের চতুর্দশ বর্ষের ২৬ শে সফর ১৪ বৃহস্পতিবার দারুন নাদওয়াতে কুরাইশ মুশরিকরা ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য কাজের চক্রান্ত করতে বসে। যার বিষয় ছিলো ইসলামকে মূল থেকে উৎপাটিত করে ফেলা।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ যখন তাদের ষড়যন্ত্রের নীলনকশা আঁকতে দারুন নাদওয়া (কুরাইশদের সংসদ) পৌঁছেলো, তখন ইবলীশ স্বয়ং এক পণ্ডিতের বেশে উপস্থিত হলো। নিজেকে সে নাজদের শায়খ বলে পরিচয় দেয়।

চক্রান্তের বিস্তারিত ঘটনা:

প্রথমে আবুল আসওয়াদ বললো, আমরা তাঁকে এ শহর থেকে বের করে দেই। তারপর তাঁর সাথে আমাদের সাথে কোনই সম্পর্ক থাকবে না। ফলে শায়খ নাজদী এই বলে বাঁধ এ শহর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে। কিন্তু শায়খ নাজদী এই বলে বাঁধ দিলো, শহর থেকে বের করে দিলে সে কোনো আরব গোত্রে আশ্রয় নেবে এবং পরে তোমাদের উপর আক্রমণ করে বসবে। তোমরা অন্য চিন্তা করো।

আবুল বুখতারী বললো, তাঁকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখো। তার উপর দরজা বন্ধ করে দাও। এভাবে না খেয়ে সে মারা যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

শায়খ নাজদী বললো, এভাবে তাঁর খবর তাঁর অনুসারীদের কাছে পৌঁছে যাবে। তাঁরা তখন হামলা চালিয়ে তাঁকে মুক্ত করে নেবে। অন্য চিন্তা করো।

শয়তান (আল্লাহ তাকে আরও অপদস্থ করুক) চাচ্ছিলো আরও খারাপ কিছু। এবার তার দাসের আবু জাহেল মুখ খুললো; যে মুখ থেকে ভালো খবর আশা করা যায় না। সে বললো, আমার প্রস্তাব হলো প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে সুঠাম দেহবিশিষ্ট যুবক নির্বাচন করে তাদের হাতে ধারালো তলোয়ার দেওয়া হবে। তারা প্রত্যেকে এক সাথে তলোয়ার মেরে তাঁকে হত্যা করবে। আর বনু আব্দে মানাফ সকলের সাথে যুদ্ধ করে পারবে না। তাই তারা দিয়াতে রাজি হয়ে যাবে।

শায়খ নাজদী তার কথায় খুশি হয়ে বললো, "এটিই সবচেয়ে অগ্রগণ্য চিন্তা। যা সম্ভবের যোগ্য।" এভাবে চক্রান্ত স্থির করার পর সবাই তা বাস্তবায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

রাসূল ﷺ এর হিজরত:

রাসূল ﷺ এর দাওয়াতী কাজ বন্ধ করতে না পেরে মক্কার পাপিষ্ঠ কুফফাররা ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এমনই সময় জিবরাঈল আ. মহান প্রভুর বাণী নিয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে থেকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, আপনার প্রভু মক্কা সময় নির্ধারণ করে দেন এবং কুরাইশদের কীভাবে প্রতিহত করতে হবে,তাও বলে দেন। এ কথাও বলে দেন যে, আপনি আজ রাতে আপনার শয্যায় শয়ন করবেন না।

হিজরতের নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে রাসূল ﷺ ঠিক দুপুরে লোকজন যখন বাড়িতে বিশ্রাম নেয়, তখন আবু বকর রাযি. এর গৃহে তাশরীফ এনে তাঁকে হিজরতের আদেশের কথা জানান। অতঃপর হিজরতের সময় নির্ধারণ করে রাসূল ﷺ আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাতের অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর প্রস্তুতির ব্যাপারে কেউ কিছুই জানলো না।

রাসূল ﷺ এর বাড়ি ঘেরাও:

কাফেররা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১১ জন পাপিষ্ঠের একটি দলকে রাসূল ﷺ এর বাড়ি ঘেরাও করার জন্য নির্বাচন করে। রাসূল ﷺ আলী রাযি. কে তাঁর সবুজ হাজরামী চাদর গায়ে দিয়ে স্বীয় বিছানায় শুইয়ে দেন এবং বলেন, ওরা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।

রাতের এক তৃতীয়াংশ গত হওয়ার পর তারা রাসূল ﷺ এর বাড়িতে হাজির হয় এবং তাঁকে আটকানোর জন্য তাঁর গৃহের দরজায় অবস্থান নেয়।

হিজরতের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ এর গৃহ ত্যাগ:

এমন এক কঠিন মুহূর্তে রাসূল ﷺ মুশরিকদের কাতার ফেঁড়ে এক মুষ্টি কংকরযুক্ত মাটি নিয়ে তাদের মাথার উপর ছিটিয়ে দিলেন। এতে করে তারা রাসূল ﷺ কে আর দেখতে পেলো না। তখন তিনি এ আয়াতে কারীমা পাঠ করেছিলেন-

"আমি তাদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না।" (সূরা ইয়াসীন:৯)

এরপর রাসূল ﷺ আবু বকর রাযি. কে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ইয়ামান অভিমুখে যাত্রা শুরু করে রাতের আঁধারে সাওর নামক পর্বত গুহায় পৌঁছলেন। অপরদিকে কাফেররা রাত বারোটার অপেক্ষা করছিল। তার আগেই তাদের নিকট তাদের ব্যর্থতার সংবাদ পৌঁছে গেলো। তারা উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে রাসূল ﷺ কে দেখতে না পেয়ে সকাল পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করলো এবং তথায় আলী রাযি. কে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলো, মুহাম্মাদ (ﷺ) কোথায়? আলী রাযি. বললেন, আমি জানি না।

রাসূল ﷺ গৃহ থেকে গুহার পথে:

রাসূল ﷺ ২৭ শে সফর নবুওয়াতের চৌদ্দতম বছর মোতাবেক ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ কিংবা ১৩ই সেপ্টেম্বর১০৮ মধ্যরাতের কিছু সময় পর নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে আবু বকর রাযি. এর গৃহে গমন করেন। সেখান থেকে পেছনের একটি জানালা দিয়ে আবু বকর রাযি. কে সাথে নিয়ে রাতের আঁধারে মদীনার পথ না ধরে উল্টো পথে উত্তর দিকে ইয়ামানের পথ ধরে চলতে শুরু করলেন। এ পথে তিনি পাঁচ মাইল অতিক্রম করে ঐতিহাসিক সাওর পর্বতে আরোহণ করেন। এ গুহায় আরোহণের পথ খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। তিনি পদচিহ্ন গোপন করার জন্য আঙ্গুলের উপর ভর করে হাঁটছিলেন। এতে করে তাঁর পা মোবারক জখম হয়ে যায়। ইতিহাসে এটিই গারে সাওর নামে পরিচিত।

সাওর পর্বতের গুহায় প্রবেশ :

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরকে নিয়ে গুহায় আশ্রয় নেন। এই পর্বতটি ছিল অত্যন্ত খাড়া এবং সেখানে ছিল প্রচুর ধারালো পাথর। গুহার মুখের নিকট পৌঁছে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আগে প্রবেশ করেন এবং গুহার সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করে দেন। তারপর তিনি মহানবী ﷺ কে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। রাসূল ﷺ ভেতরে ঢুকে ক্লান্ত-শ্রান্ত

অবস্থায় আবু বকরের উরুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন। গর্তের ভেতর থেকে সাপ অথবা বিচ্ছু আবু বকরকে দংশন করল। তিনি তীব্র বিষের যন্ত্রণায় কাতর হলেন না, নাড়াচাড়া করলেন না বা কোন শব্দ করলেন না- যেন রাসূল এর ঘুম ভেঙে না যায়। চরম যন্ত্রণায় তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল এবং সেই অশ্রু গিয়ে পড়ল রাসূল এর মুখের উপর। রাসূল এর ঘুম ভেঙে গেলে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আবু বকর, তোমার কী হয়েছে?" আবু বকর বললেন, "আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, গর্তের ছিদ্রপথে কোন কিছু আমার পায়ে কামড় দিয়েছে।" একথা শুনে রাসূল ﷺ নিজের মুখ থেকে কিছু লালা নিয়ে সেই ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিলেন ফলে আবু বকরের ব্যথা দূর হয়ে গেল। এই পর্বতের গুহায় তারা পরপর তিনরাত্রি অর্থাৎ শুক্র, শনি ও রবিবার রাত্রি অবস্থান করলেন। সাওর পর্বতে থাকাকালীন সময়ে আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে রাত্রি যাপন করতেন। তিনি দিনের বেলায় মক্কায় কুরাইশদের আশেপাশে থাকতেন এবং খবর সংগ্রহ করতেন। আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খাবার নিয়ে যেতেন। এছাড়াও আবু বকরের মুক্ত ক্রীতদাস আমের বিন ফুহাইরা সারাদিনই পর্বতের ময়দানে ছাগল চড়াত। কুরাইশরা পাগলের মত তাদের খুঁজতে লাগল। এমনকি তারা খুঁজতে খুঁজতে এক পর্যায়ে সাওর পর্বতের গুহার প্রবেশ পথের সামনে পৌঁছে গেল। আল্লাহ সুবহানা তায়ালা তাদেরকে রক্ষা করেন।

মদিনার পথে যাত্রা

তিন দিন যাবৎ খোঁজাখুঁজির পর কুরাইশদের ক্রোধাগ্নি কিছুটা প্রশমিত হলে রাসূল ﷺ ও আবু বকর রাযি. মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। পূর্বেই আব্দুল্লাহ ইবনে উরাইকিত লাইসি’র (তিনি তখনো মুশরিক থাকলেও পথ প্রদর্শক হিসেবে তাঁর উপর নির্ভর করার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না) সাথে মজুরির বিনিময়ে মদীনায় পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য চুক্তি হয়েছে এবং তাঁর নিকট দুটি বাহনও রাখা হয়েছে। তিনি মদীনা যাওয়ার সাধারণ পথ না ধরে প্রথমে লোহিত সাগরের উপকূলের পথ ধরে যাত্রা শুরু করেন। এভাবে একপর্যায়ে তাঁরা কুবা গিয়ে উপনীত হন।
সুরাকার ঘটনা:

নবীজি যখন ছোট কাফেলা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আবু জাহেলের ১০০ উট পুরস্কারের লোভে সুরাকা বিন মালেক চারদিকে নবীজিকে খোঁজা শুরু করলেন। একপর্যায়ে সে নবীজির কাফেলা দেখতে পেয়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেল এবং কাছাকাছি আসার পর তার ঘোড়া হোঁচট খেলো, সে মাটিতে ছিটকে পড়ে গেল। পুনরায় সে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যায় সে নবীজির একদম কাছে চলে আসে সে নবীজির তিলাওয়াত শুনতে পাচ্ছিল। আবু বকর রা: বারবার পিছন দিকে ফিরে তাকে দেখছিলেন। নবীজি তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করেননি। কাছাকাছি আসার পর শক্ত সুরাকার ঘোড়ার পা পর্যন্ত দেবে গেল। সুরাকা মাটিতে পড়ে গেল এবং অনেক চেষ্টা করতে লাগলো তার ঘোড়াকে তুলতে। শেষে অপারগ হয়ে নবীজির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করল, নবীজি থেমে গেলেন সাথে সাথে তার ঘোড়ার পা মাটি থেকে বের হয়ে এলো। এবং নবীজি তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয় কিন্তু সে গ্রহণ করে না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করে নবীজির সংবাদ কাউকে বলবেনা। এই যাত্রা তেই নবীজি উম্মে মাবাদের বাড়িতে যান। পরবর্তীতে তারা দুজন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা হিজরত করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসূল ﷺ এর শারীরিক গঠন:

রাসূল ﷺ, আবু বকর (রা.), আমির বিন ফুহাইরাহ এবং আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত (পথপ্রদর্শক) হিজরতের সময় পথ চলতে চলতে এক পর্যায়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে মরুভূমির মাঝে একটি তাঁবুতে গেলেন। সেখানে উপস্থিত জনৈক বৃদ্ধার (যার নাম উম্মে মাবাদ, তিনি পরে মুসলিম হয়েছিলেন) কাছে তিনি খাবার চাইলে বৃদ্ধা জানালেন যে তার কাছে খেতে দেওয়ার মতো কিছুই নেই। অদূরে একটি হাড় জিরজিরে শুকনো বকরিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি বৃদ্ধার কাছে সেটির দুধ দোহন করার অনুমতি দিলেন। বৃদ্ধা হতাশার সাথে অনুমতি দিলেন। রাসূল ﷺ বকরির ওলানে হাত দেওয়ার সাথে সাথে তা স্ফীত হয়ে উঠল এবং রাসূল ﷺ একটি বাটি ভর্তি দুধ দোহন করলেন। সেটি বৃদ্ধাকে খেতে দিয়ে এরপর পুনরায় দোহন করলেন এবং নিজে ও সঙ্গীদের খেতে দিলেন।

এরপর পুনরায় দোহন করে এক বাটি ভর্তি দুধ বৃদ্ধার কাছে রেখে বিদায় নিলেন। পরবর্তীতে বৃদ্ধার স্বামী আবু মাবাদ ঘরে ফিরলে বৃদ্ধা এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তার স্বামীকে জানায়। সব শুনে স্বামী কৌতূহলী হয়ে আগন্তুকের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার

আগ্রহ প্রকাশ করে। উম্মে মাবাদ তখন তার স্বামীকে রাসূল ﷺ এর যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তাকে রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম অনুপম বর্ণনা বললেও ভুল হবে না।

উম্মে মাবাদ যখন নবীজীকে দেখেন তখন নবীজী যাত্রা ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন,

"একজন মানুষকে দেখলাম,

চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্ন, আলোকোজ্জ্বল মুখ,

সর্বোত্তম দেহসৌষ্ঠব, পেট অস্বাভাবিক মোটা নয়, মাথার আকার দৃষ্টিকটু ছোট নয়,

চেহারা জীবনভর দেখলেও প্রশান্তি হয় না (অর্থাৎ ক্লান্তি আসে না), সর্বাধিক জীবনভর দেখলেও প্রশান্তি হয় না,

তাঁর চোখে ছিল একটি বৈপরিত্য (সাদা ও কালোর চমৎকার সমন্বয়), তাঁর চোখের পাতার লোম লম্বা, তাঁর কণ্ঠে ছিল না কর্কশতা,

তাঁর গলা ছিল পরিমিত লম্বা, তাঁর দাড়ি ছিল পরিপূর্ণ এবং ঘন কালো। অংশ কুচকুচে কালো, সাদা অংশ ধবধবে সাদা মনে হয় যেন চোখের পাতায় সুরমা লাগানো। ভ্রু ছিল মোটা এবং ধনুকের মতো বাঁকানো। দুই ভ্রু মাঝে জোড়া ছিল না, চুল ছিল কুচকুচে কালো। যখন নীরব থাকতেন তখন এক শ্রদ্ধা পূর্ণ গাম্ভীর্য ভর করত। কথা বলার সময় ছিলেন চমৎকার, ঝলমলে। দূর থেকে তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও স্মার্ট, কাছে থেকে মনে হত তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ। মুখের কথা ছিল সুমিষ্ট, পরিষ্কার, যৌক্তিক। কথায় ছিল দৃঢ়তা, কথা না ছিল অতি সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট আর না ছিল অপ্রয়োজনীয় লম্বা। তাঁর কথা শুনে মনে হত যেন নেকলেস থেকে একের পর এক মুক্তো খুলে পড়ছে।মধ্যম গড়নের, তাঁর দিকে তাকানোর জন্য মাথা নিচু করতে হত না আবার উঁচুই করতে হত না। তিনি ছিলেন দুই ডালের মধ্যে একটি ডাল; অনেকের মধ্যে থাকলে সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর চারপাশে একদল সাহাবি ছিল। যখন তিনি কথা বলতেন তখন তাঁরা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তা শুনতেন আর যখন তিনি কিছু আদেশ করতেন তখন তাঁরা তা পালনের জন্য ছুটে যেতেন। তাঁর যত্নের ঘাটতি ছিল না, চারপাশে সাহাবিদের ভিড় লেগে থাকত। তাঁর মুখ দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিল না, আর না তিনি ছিলেন বাচাল।

কুবাতে রাসূল ﷺ এর আগমন:

অবশেষে নানা বাধা-বিপত্তি অতিবাহিত করে রাসূল ﷺ ৮ই রবিউল আউয়াল, নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছর মোতাবেক ২৩ শে সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় এসে উপনীত হোন। এ সময় তাঁর বয়স বরাবর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছিল। মক্কা থেকে রাসূল ﷺ এর রওয়ানার সংবাদ শুনে মদীনাবাসীগণ প্রত্যহ দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তাঁর পথ চেয়ে থাকতেন। একদিন তারা ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশায় একটি তিবির উপর আরোহণ করলো। পর এক ইয়াহূদী তার কোনো কাজে একটি তিবির উপর আরোহণ করলে তখন সে রাসূল ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের দেখতে পেয়ে মদীনাবাসীদের মাঝে এ সংবাদ ঘোষণা করে দিলো। তার ঘোষণা শুনে সকলে রাসূল ﷺ কে স্বাগত জানানোর জন্য অস্থির হয়ে সমবেত হলো। রাসূল ﷺ কুলসুম ইবনে হাদম এর বাড়িতে অবস্থান করলেন। সে সময়টা ছিল রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার। তিনি কুবায় চার দিন অবস্থান করেন। এদিকে আলী রাযি. মক্কায় রাসূল ﷺ এর নিকট রাখা মানুষের আমানত বুঝিয়ে দিয়ে তিনিও এসে কুবায় তাঁর সাথে মিলিত হোন। প্রথম দিনে রাসূল ﷺ আল্লাহর নির্দেশে আরোহণ করেন। অতঃপর তাঁর মামাগোষ্ঠী বনু নাজ্জারদের সাথে নিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা শুরু করেন। পথিমধ্যে জুমার নামাজের সময় হলে তিনি বাতনে ওয়াদী নামক স্থানে জুমার নামাজ পড়েন। সেখানে মোট একশ’ লোক ছিল।

আলী রা: এর হিজরত :

রাসুল ﷺ এর সকল আমানত কাফেরদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আলী রা: হিজরত করেন। কুবায় এসে তিনি নবীজির সাথে মিলিত হন। সেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারদিন অবস্থান করেন। এবং সেখানে তিনি একটি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তু স্থাপন করলেন। সাহাবীদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। নবুয়তের পর এটাই মুসলমানদের স্থাপিত সর্বপ্রথম মসজিদ। যা তাকওয়ার উপরে নির্মিত।

মদীনার দিকে রওনা:

এরপর তিনি শুক্রবারে আল্লাহর নির্দেশে যাত্রা শুরু করেন। তিনি আগে থেকেই তার নানার বংশের গোত্র বনু নাজ্জার কে সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কে গ্রহণ করার জন্য কুবায় উপস্থিত হন। এরপর তিনি বাতনে ওয়াদি নামক স্থানে পৌঁছালে জুমার সালাতের সময় হয়ে যায় এবং রাসুল ﷺ সেখানে জুমা আদায় করেন।

জুমার সালাত শেষ করে রাসুল ﷺ মদীনায় প্রবেশ করেন। এদিন থেকেই ইয়াসরিবকে মদিনা তুর রসুল অথবা রসুলের শহর বলা হয়। মদিনার জন্য ওই দিনটি ছিল ঐতিহাসিক দিন।

আনসারগণ সকলের আশা ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাড়িতে অবস্থান করবেন। তারা প্রত্যেকে অস্থির হয়ে গেলেন। কিন্তু নবীজি তাদের বললেন উটের পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত রয়েছে। ফলে উট চলতে লাগলো এবং যেখানে বর্তমানে মসজিদে নববী রয়েছে সেখানে এসে বসে পড়ল। কিন্তু তিনি নিচে নামলেন না। উট পুনরায় উঠে দাঁড়ালো এবং কিছুদূর ঘোরাফেরা করে পুনরায় আগের জায়গায় এসে বসে পড়ল। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেমে পড়লেন। এটাই ছিল তার নানার গোত্রের এলাকা। তিনি আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়িতে প্রবেশ করেন। যতদিন পর্যন্ত মসজিদে নববী ও আপন হুজরা নির্মাণ কাজ চলে ততদিন সেই বাড়িতেই ছিলেন। রাসুল ﷺ এর মদিনায় আগমনের কিছুদিন পর রাসুল যায়েদ বিন হারিসা ও তাঁর গোলাম আবু রাফি'কে দুটি উট ও ৫০০ দিরহাম দিয়ে মক্কায় পাঠান যেন তাঁরা ফাতিমা, উম্মে কুলসুম, সাওদা, উসামা বিন যায়েদ ও উম্মে আয়মান কে মদিনায় নিয়ে যেতে পারেন। এর কিছুদিন পর আবু বকর এর ছেলে আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর রাঃ আয়েশা রাঃ ও আসমা রাঃ কে সাথে নিয়ে মদিনায় এসেছিলেন। রাসুলের কন্যা যায়নাব রাঃ মক্কায় তার স্বামী আবুল আসের নিকট থেকে গিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের পর তিনি মদিনায় আসেন।

নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব

একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনের জন্য রাসূল ﷺ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন।নিম্নে সেগুলো বর্ণনা করা হলো:

মসজিদে নববী নির্মাণ:

মদিনায় রাসূল ﷺ এর উট যেখানে বসে পড়েছিল সে জায়গাটি ছিল দুজন ইয়াতিম বালকের। তাদের নাম ছিল সাহল ও সুহাইল। জায়গাটি ছিল খেজুর শুকানোর স্থান। বালক দুটির অভিভাবক ছিল তাদের চাচা (একটি বর্ণনা অনুযায়ী তাদের অভিভাবক

ছিলেন আস'আদ বিন যুরারাহ)। রাসূল ﷺ তাকে ডেকে পাঠালেন এবং তার সাথে তিনি জমির মূল্য নিয়ে কথাবার্তা বললেন। বালক দুজন কোন বিনিময় ছাড়াই জমিটি রাসূল ﷺ কে দিয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু রাসূল ﷺ তাদের এই আবেদন গ্রহণ করলেন না বরং ১০ দিরহাম মূল্য নির্ধারণ করে সেই জমিটি কিনে নিলেন। এই জমির মূল্য পরিশোধ করেছিলেন আবু বকর। জায়গাটিতে কিছু খেজুর গাছ ছিল এবং মুশরিকদের কবর ছিল। রাসূল গাছগুলো কেটে ফেলতে বললেন এবং মুশরিকদের কবরগুলো সমান করে দিতে বললেন। এরপর মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে কাঁচা ইট তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। সকল আনসার ও মুহাজির সাহাবী এবং রাসূল নিজেও এই কাজে অংশ নিলেন। সাহাবিদের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করার সময় রাসূল বলছিলেন—
"এটা খাইবরের খেজুরের বোঝা নয়, হে আল্লাহ! এ বোঝা সবচেয়ে উত্তম।" মসজিদে নির্মাণ শেষ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীদের জন্য কামরা নির্মাণ করেন। একটি সাওদা বিনতে জাময়া রা: ও আরেকটি আয়েশা রা: এর জন্য। মসজিদের পাশেই ছিল হারেসা ইবনে নোমান এর বাড়ি। যখন উম্মুল মুমিনিনদের জন্য নতুন ঘর তৈরি প্রয়োজন হতো তখন তিনি রাসূলের জন্য ঘরের জায়গা দিয়ে দিতেন। তাদের ঘরগুলো চুন ও বালির কাদা এবং কাঁচা ইট পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। খেজুর গাছের ডাল পাতা দিয়ে ছাদ নির্মাণ করা হয়েছিল। কামরাগুলোর দরজায় পর্দা হিসেবে থাকতো চটের টুকরা অথবা কম্বল। অধিকাংশ রাতেই কামড়াগুলিতে কোন বাতি জ্বলতো না।
মসজিদে নববীর এক পাশে আহলুস সুফফাদের ছাউনি নির্মাণ করেন। এখানে যেসব সাহাবীরা থাকতেন তাদেরকে বলা হতো আসহাবুস সুফফা। তারা ছিলেন ইসলামের অতিথি তাদের কোন স্থায়ী সম্পদ কিংবা পরিবার পরিজন ছিল না। তারা সর্বক্ষণ সেখানে অবস্থান করতেন এবং রাসূলের কাছ থেকে সার্বক্ষণিক দ্বীন শিক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন।

মদিনা সনদ রচনা:
মদিনায় সে সময় ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস। মুসলিম ছাড়াও ইহুদিদের তিনটি গোত্র এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অনেক পৌত্তলিকদের আনাগোনাও ছিল। এমন একটি সমাজে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আনুগত্য, পারস্পরিক বিবাদ ও শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্তে রাসূল ﷺ

সর্বসম্মতিক্রমে একটি সংবিধান প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইতিহাসে এই সংবিধান 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত।

মুজাহিদ বাহিনী গঠন :
মদিনায় পৌঁছে রাসুল ﷺ মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তুলেন। এখানে কেউই পেশাদার সৈনিক ছিলেন না তারা ছিলেন সাধারণ নাগরিক। তারা ছিলেন সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেসামরিক নাগরিক। জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে চারটি শর্ত পূরণ করতে হতো। তাদের অবশ্যই মুসলমান হতে হবে, তাদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে, শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে কারণ তখন রাষ্ট্রের খরচ বহন করার মত অবস্থা ছিল না। সাহাবীরা শারীরিকভাবে শক্ত সামর্থ্য ছিলেন। অনেক কঠিন কঠিন কাজ করে অভিজ্ঞ ছিলেন। তবুও কিছু দক্ষতা প্রয়োজন ছিল। যা তাদেরকে শিখার নির্দেশ দেন। সাঁতার থেকে শুরু করে তীর চালনা লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি নানা রকম খেলার সাথে তিনি তাদের সখ্যতা গড়ে তুলেন।

জিহাদ ফরজ হওয়ার ধাপসমূহ

জিহাদ ফরজ হয়েছে চারটি ধাপে-
প্রথম ধাপে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। এটি হলো মক্কায় রাসুল এর জীবনের সেই সময়ে যখন রাসুল ﷺ কে ধৈর্যধারণ করতে বলা হয়েছিল।
দ্বিতীয় ধাপে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু যুদ্ধ ওয়াজিব করা হয়নি। আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করে এই বিধান দেন-
যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।(সূরা হাজ্জ, ২২:৩৯)
তৃতীয় ধাপে যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন- আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা বাক্বারাহ, ২:১৯০)

চতুর্থ ধাপে সব কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে এই আয়াতের মাধ্যমে-আল্লাহ বলেন,

নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন। (সূরা তাওবাহ, ৯:৩৬)

মুসলিম বাহিনীর অবস্থা বিবেচনা করেই যুদ্ধের বিধান ধাপে ধাপে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধে প্রস্তুতির জন্য সময় প্রয়োজন ছিল প্রয়োজন ছিল একটি শক্ত ইসলামী রাষ্ট্রের শত্রুর ভয়, চারপাশে থেকে নবিজির উপর নানান হামলা আসার আশংকা সমস্ত কিছু নিয়ে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরী হয় মদীনাতো। এই প্রতিকূলতা ও বিপত্তি গুলো থেকে উদ্ধার পাওয়া মুসলমান দের জন্য একটা অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়ায়। এমন অবস্থায় আল্লাহ রব্বুল আল আমিন মুসলমানদের যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন। যুদ্ধের অনুমতি পাওয়ার পর মুসলমান দের সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। প্রহরী হিসেবে মুসলিম সেনাবাহিনী মদীনা ও তার সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা এর জন্য কাজ করা শুরু করে।

গাজওয়া এবং সারিয়ার পার্থক্য:

গাজওয়াঃ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনীর অভিযান গুলোকে গাজওয়া বলে। নবীজির অংশগ্রহণে যে যুদ্ধগুলো হয়েছে তাই গাজওয়া। সেনাবাহিনী কম বা বেশি সেটা বিষয় না এবং যুদ্ধ হওয়া বা না হওয়াও এখানে প্রভাব ফেলে না

সারিয়াঃ যে সব সৈন্যদলকে সাহাবীদের নেতৃত্বে পাঠানো হতো তাদের সারিয়া বলা হতো যা রাসূল ﷺ পাঠাতেন কিন্তু নিজে অংশগ্রহণ করতেন না। এক্ষেত্রে ও যুদ্ধ না হওয়া বা না হওয়া, কিংবা শত্রুর কম বেশি হওয়া এতে প্রভাব ফেলেনা। বেশির ভাগ সময় সারিয়া তে সৈন্য সংখ্যা কম হতো। মূলত নিজেদের নিরাপত্তা বা শত্রুদের বিভ্রান্ত করাই উদ্দেশ্য ছিল। এবং এতে নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধ হতোনা।

গাজওয়া সারিয়া এর সংখ্যা:

রাসূল ﷺ এর হিজরতের পর থেকে যতগুলো গাজওয়া ও সারিয়া সংঘটিত হয় তা নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ আছে। এই মতভেদ এর কারণ হলো অনেক সীরাহ এর আলেমগন সময়ের ব্যবধান কম হলে একটাই ধরেছেন।

মতানুসারে ২৭ টি, ২৮ টি, ২৯ টি, ১৯ টি গাজওয়া এর উল্লেখ করেছেন মূসা ইবনে উকবাহ, মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ওয়াকেদী, ইবনে সা'দ, ইবনে জাওযী, সাইদ ইবনে মুসাইয়্যাব, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ, ইয়াজিদ ইবনে আরকাম রাহিমাহুল্লাহ। সারিয়া এর ক্ষেত্রে ইবনে সা'দ এর মতে ৪০ টি, ইবনে আব্দুল বার এর মতে ৩৫ টি, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এর মতে ৩৮ টি, ওয়াকেদী এর মতে ৪৮ টি এবং ইবনে জাওযী এর মতে ৫৬ টি।

অস্ত্রের ঝনঝনানি:

মুসলিমগণ যখন মক্কায় ছিলেন, তখন তাঁদের উপর মুশরিকরা নির্যাতনের ষোলকলা পূর্ণ করে। কিন্তু মদীনায় আসার পর মুসলিমগণ তাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। তাঁদের নিরাপদ আশ্রয় ও ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করা দেখে মুশরিকদের ক্রোধ অতিমাত্রায় বেড়ে যায়। তারা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নিকট একটি হুমকি পত্র প্রেরণ করে। সেখানে উল্লেখ ছিলো, তোমরা বিপথগামী লোকদের আশ্রয় দিয়েছো। হয় তোমরা তাঁদেরকে বহিষ্কার করবে; না হয় আমরা তোমাদের উপর আক্রমণ করে তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করবো ও মহিলাদের মানহানি করবো।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তখনও ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়নি। সে মদীনার কিছু অধিবাসীকে নিয়ে কুরাইশদের কথামতো কিছু মুশরিককে মুসলিমদের বিরুদ্ধে একত্র করে। রাসূল ﷺ তা জানতে পারেন ও তাদের নিকট এসে বলেন, কুরাইশদের হুমকি তোমাদের অন্তরে রেখাপাত করেছে। কিন্তু তারা তোমাদের তেমন ক্ষতি করতে পারবে না। আর তোমরা কি নিজ পুত্র ও ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? রাসূল ﷺ এর এ বক্তব্যের ফলে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।১৭৫ ফলে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পরিকল্পনা ভেঙে যায়।

তাছাড়া সে ইয়াহূদীদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে থাকে। ক্ষণে ক্ষণে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করতে থাকে। কিন্তু রাসূল ﷺ এর সময়োচিত ও বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থাপনার ফলে সে সফল হতে পারেনি।

বদর যুদ্ধের পূর্ববর্তী সারিয়া এবং গাজওয়া সমূহ

গাজওয়াতুল আবওয়া ও গাজওয়াতুল ওয়াদানঃ-

রাসূল ﷺ কর্তৃক পরিচালিত প্রথম গাজওয়া ছিল গাজওয়াতুল আবওয়া বা গাজওয়াতুল ওয়াদ্দান। মুসলমান সাহাবীদের প্রথম যুদ্ধ রাসূলকে সাথে নিয়ে। আবওয়া ও ওয়াদ্দান পাশাপাশি দুইটি এলাকা। এই গাজওয়াটি হয় দ্বিতীয় হিজরির সফর মাসে। মুসলিম সেনা ছিল প্রায় ২০০ জন। এই সফরে কোন যুদ্ধ হয়নি বরং কিনানা গোত্রের বনু যামারার সাথে সন্ধি হয়। ১৫ দিন পর রাসূল ﷺ মদীনায় ফিরে আসেন।

সারিয়া উবায়দা ইবনুল হারিস বা সারিয়াতু রাবিগ :

ইসলামী পতাকার নেতৃত্বে এটাই মুসলিমদের প্রথম সারিয়া। ১ম হিজরির শাওয়াল মাসে এই সারিয়া রাসূল ﷺ পাঠান, যাতে সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭০ জনের মতো, অন্যান্য মত অনুযায়ী ৬০/৮০ মুহাজির সাহাবি ছিলেন। রাসূল ﷺ উবাইদাহ ইবনু হারিস ইবনু মুত্তালিব কে এই বাহিনী এর নেতা হিসেবে নির্বাচন করেন। এ অভিযানে তারা রাবিগ উপত্যকায় মুশরিকদের সম্মুখীন হয়। যেখানে আবু সুফিয়ান এর নেতৃত্বে প্রায় ২০০ জন মুশরিক ছিল। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস শত্রুদের দিকে প্রথমবার মুসলিমদের হয়ে তীর নিক্ষেপ করেন। যুদ্ধটি খুব বেশী দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। মক্কা থেকে মিকদাদ বিন আমর ও উতবাহ বিন গাযওয়ান কাফিরদের সাথে আসে মদীনার মুসলমানদের সাথে যোগ দিতে, যারা আগে থেকেই মুসলমান ছিল।

সারিয়া হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব বা সারিয়াতুল সীফিল বাহর:

আবু ইসহাক এর বর্ণনা মতে, রাসূল ﷺ আবওয়া থেকে মদীনায় ফিরে হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব কে সেনাপতি নিযুক্ত করে ঈস এর সমুদ্র উপকূলে প্রায় ত্রিশ জন মুহাজির সাহাবী পাঠান। এই সারিয়াতে শুধু মুহাজির ছিল। সেই অঞ্চলে তারা আবু জেহেল এর মুখোমুখি হয় এবং আবু জেহেল এর সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০ জন। কিন্তু জুহায়না গোত্রের নেতা মাজদী ইবনে আমর বাধা দেন এবং উভয় পক্ষেরে মিত্র হয়ে তাদের দুই দলকে শান্ত করেন। হামযা রা. এর এটা ছিল প্রথম পতাকা যা রাসূল ﷺ নিজ হাত দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন।

গাজওয়াতুল বুওয়াত:

দ্বিতীয় হিজরি রবিউল আউয়াল মাসে রাসূল ﷺ ২০০ জন সাহাবীর দল নিয়ে বের হন। উমাইয়া ইবনে খালাফ ও কুরাইশ কাফেলার পথ রোধ করাই উদ্দেশ্য ছিল। মুসলমান বাহিনী রাযওয়ার পার্শ্ববর্তী বুওয়াত নামক স্থানে পৌঁছান। তাদের দেখা পান না তাই আবার ফিরে আসেন।

গাজওয়াতুল উশাইরা:

রাসূল ﷺ মদীনাতে আবু সালমা ইবনু আদিল আসাদ কে শাসনভার দিয়ে কুরাইশদের ধরার জন্য উশাইরার উদ্দেশ্যে বের হন। সেখানে তিনি ২য় হিজরির জুমাদুল উলার পুরো মাস ও জুমাদাল উখরার কিছুদিন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি বনু মুদলিজ এবং তাদের মিত্র বনু যামরার সাথে চুক্তি করেন। তারপর মদীনায় ফিরে আসেন। কারণ সম্পদবাহী যেই কাফেলাকে উদ্দেশ্য করে নবী ﷺ গিয়েছিলেন তারা আগেই শাম এর দিকে চলে যায়।

গাজওয়ায়ে সাফওয়ান:

এই গাযওয়াটি সংঘটিত হয় ২য় হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে। এর কারণ ছিল কুরয ইবনে জাবের ফিহরী মদীনার চরণভূমিতে আক্রমণ করে কিছু উট ও বকরী নিয়ে যায়। রাসূল ﷺ তার খোঁজে বের হয়ে বদরের পাশে সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত যান। কিন্তু তাকে ধরতে না পেরে মদীনায় ফিরে আসেন। এই অভিযানে সৈন্য ছিল প্রায় ৭০ জন। পরবর্তীতে কুরয ইবনে জাবের ইসলাম গ্রহণ করেন।

সারিয়া সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস বা সারিয়ায়ে খাররার:

রাসূল ﷺ ১ম হিজরি এর যুলকাদাহ মাসে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ও সাথে ৮ জন সৈন্য দিয়ে কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য পাঠান। তিনি হিজাযের খাররার নামক জায়গা পর্যন্ত যান। এই যাত্রায় তারা এত বেশি গোপনীয়তা বজায় রাখতেন যে দিন এর বেলা লুকিয়ে থাকতেন রাতের বেলা হাটতেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা জানতে পারেন এক দিন আগেই কাফেলা চলে গিয়েছে। তারা ফিরে আসেন।

ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধের পটভূমি

বদরের প্রথম গাজওয়া অথবা গাজওয়ায়ে সাফওয়ান:

২য় হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে কুরায ইবনে জাবের ফিহরী মদীনার চারণভূমিতে আক্রমণ করে কিছু উট ও বকরি নিয়ে যায়। রাসূল তার খোঁজে বের হয়ে বদরের পার্শ্ববর্তী সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত যান। কিন্তু কুরয ইবনে জাবের পালিয়ে যায়। রাসূল ﷺ তাকে ধরতে না পেরে মদিনায় ফিরে আসেন। এই অভিযানে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৭০ জন।

কুরায ইবনে জাবের পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। উরাইনা গোত্রের বিরুদ্ধে রাসূল যখন ২০ জন সৈন্যের বাহিনী প্রেরণ করেন তখন এর নেতৃত্বের দায়িত্বে ছিলেন কুরয ইবনে জাবের। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

সারিয়ায়ে নাখলা বা সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ :

দ্বিতীয় হিজরির রজব মাসের শেষ এর দিকে কুরাইশদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ আসাদী এর নেতৃত্বে ৮ জন মুহাজিরকে মতান্তরে ১২ জন এর বাহিনী রাসূল প্রেরণ করেন। উনাকে নির্দেশনা দেয়া হয় দুই দিন এর পথ অতিক্রম করার পরে যেন রাসূল কর্তৃক প্রেরিত চিঠি পাঠ করেন। যাতে লেখা ছিল,

"আমার এই পত্র পাঠ করার পর তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলবে এবং মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলায় অবতরণ করবে। এক কুরাইশ কাফেলার আগমনের প্রতীক্ষায় তোমরা সেখানে ওত পেতে থাকবে এবং তাদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবে।"

তার সেনাদের নিয়ে তিনি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নাখলায় পৌঁছান। সেখানে কুরাইশদের এক বণিক দল যাচ্ছিল যাতে অনেক মূল্যবান সম্পদ ছিল। যেই কাফেলায় ছিল ইবনে মুগীরার দুই ছেলে উসমান ও নওফাল এবং আমর ইবনে হায়রামী ও হাকাম ইবনে কায়সান। এবং সেই দিন ছিল রজবের শেষ দিন। এবং তারা শুধু মাত্র খবর আনার লক্ষ্য সেখানে গেলেও তারা আক্রমণ করে বসে। এবং মুসলমানদের ছোড়া তীর এ আমর ইবনে হায়রামি মারা যায়। এবং উসমান এবং হাকাম কে বন্দী করে সমস্ত সম্পদ নিয়ে তারা মদীনায় ফিরে আসে। রাসূল দরবার এ এই গণিমত নিয়ে আসার পর উনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এই গণিমত ও যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ

করা থেকে বিরত থাকেন। এবং মুশরিকরা এই সুযোগ কাজে লাগায়। তারা বলে মুসলমানরা অপরাধী কারণ তারা হারাম মাস এ যুদ্ধ ও হত্যা করেছে। তখন আল্লাহ রব্বুল আল আমিন সূরা বাকারার ২১৭ নং আয়াত নাযিল করেন। এবং রাসূল বন্দীদের ছেড়ে দেন ও নিহত ব্যক্তির জন্য রক্তপণ দেয়ার ব্যবস্থা করেন। উসমান মক্কায় ফিরে গেলেও হাকাম ইসলাম গ্রহণ করে এবং মদীনায় থেকে যান।

কিবলা পরিবর্তন:

মদিনায় আসার পর থেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমরা বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে আসছেন। এক বছর চার মাস পর্যন্ত তারা এভাবেই সালাত আদায় করেন। তবে নবিজির একান্ত চাওয়া ছিল, কাবাকে যেন মুসলিমদের কিবলা ঘোষণা করা হয়। কেননা কাবা ছিল আরব মুসলিমদের চোখে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সবচেয়ে আলোকোজ্জ্বল প্রতীক।দ্বিতীয় হিজরিতে এই স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। বাইতুল্লাহর ভালোবাসা তাদের রক্ত-মাংসে মিশে আছে জন্মগতভাবে। তারা মনে মনে চাইতেন, কাবাগৃহকে যেন তাদের কিবলা ঘোষণা করা হয়। তারা অন্য কোনো কিবলাকে ইবরাহিম ও ইসমাইল আলাইহিমাস সালামের স্মৃতিবিজড়িত কিবলার সমকক্ষ মনে করতেন না।

বাইতুল মাকদিসকে নিজেদের কিবলা হিসেবে মানা এবং সেদিকে ফিরে সালাত আদায় করাটি তাদের কাছে একটি পরীক্ষার মতো মনে হতো। এরপরও তারা বিনাবাক্যব্যয়ে সেই বিধান মেনে নিয়েছেন। سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (শুনলাম ও মেনে নিলাম) এবং آمَنَّا بِكُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا (আমার রবের পক্ষ থেকে আগত প্রতিটি বিষয় আমরা বিশ্বাস করে নিলাম) ছাড়া তাদের মুখ থেকে অন্য কিছুই বের হয়নি। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সামনে নিজেকে অবনত মস্তকে সমর্পিত করে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই জানতেন না তারা। প্রয়োজনে নিজের ইচ্ছা, অনুভূতি, অভ্যাস ও চিন্তা ত্যাগ করতে হলেও তারা অবলীলায় তাই করতেন।

অবশেষে মহান আল্লাহ তাদের অন্তরের পরীক্ষা নিয়ে নেন। তারা কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন তাকওয়া ও আনুগত্যের পরীক্ষায়। তখনই নবিজি-সহ সকল মুমিন ও মুসলিমের কিবলা হিসেবে ঘোষিত হয় পবিত্র কাবা। কুরআনুল কারিমে এসেছে—

“এমনিভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থি সম্প্রদায় বানিয়েছি, যেন তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবজাতির জন্য এবং রাসুল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। আপনি যে কিবলার ওপর ছিলেন, তাকে আমি এ উদ্দেশ্যে কিবলা করেছিলাম, যেন এ কথা প্রমাণ হয়, কে

রাসুলের অনুসরণ করে, আর কে পেছনে ফিরে যায়। নিশ্চয়ই এটা কঠোরতর বিষয়, কিন্তু তাদের জন্য নয়, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন।(সূরা বাকারাহ-১৪৩) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে সকল মুসলিম কাবা অভিমুখী হয়ে সালাত আদায় করতে শুরু করেন। এই পবিত্র ঘরই কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমদের কিবলা হিসেবে নির্ধারিত হয়ে যায়। পৃথিবীর যেখানেই থাকুক, প্রত্যেক মুসলিম বাইতুল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়েই সালাত আদায়ের জন্য আদেশপ্রাপ্ত।

কুরাইশ কাফেলার সংবাদ :

রাসূল ﷺ খবর পেলেন শাম থেকে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশের একটি বড় বাণিজ্য কাফেলা আসছে। সেই কাফেলা তে আছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা সমপরিমাণ সম্পদ, ১০০০ উট কিন্তু এর পাহারায় আছে মাত্র ৩০ থেকে ৪০ জন ব্যক্তি। রাসূল ﷺ তখন সাহাবীদের ডেকে বললেন, আমাদের একটি অভিযানে যেতে হবে। যার যার উট প্রস্তুত আছে সে যেন রওনা দেয়। গোপনীয়তার স্বার্থে উটের গলা থেকে ঘণ্টা খুলে নেয়া হয়। দ্বিতীয় হিজরীর ১২ই রমজান তিনি সাহাবীদের কে নিয়ে মদিনা থেকে বের হন।

বদর যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা :

বদর যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ আছে। ইমাম বুখারী রাহিমুল্লাহ বলেছেন ৩১০ এর মত সৈন্য সংখ্যা ছিল ইমাম মুসলিম রাহিমুল্লাহ বলেছেন সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৩১৯ জন। তারা কেবল কাফেলা কে আক্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন আউস গোত্রের ছিল ৬১ জন, হাজরাজের ১৭০ জন এবং বাকিরা ছিল মুহাজির।

আবু সুফিয়ানের কাফেলা নিরাপদ ও কুরাইশদের ষড়যন্ত্র :-

ওদিকে আবু সুফিয়ান তার কাফেলার ওপর আক্রমণের জন্য মুসলিম বাহিনীর মদিনা থেকে রওনা দেওয়ার খবর পেলেন। শাম থেকে ফেরার পথে আবু সুফিয়ান খুব সতর্কতার সাথে মুসলিমদের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ রাখছিলেন। কোন কোন বর্ণনামতে, শাম যাওয়ার সময় পেছন থেকে মুসলিমদের আক্রমণের (গায়যাতুল উশাইরা) সংবাদ তিনি পেয়েছিলেন এবং তাই ফিরতি পথে মুসলিমদের আক্রমণের

ব্যাপারে অত্যাধিক সচেতন ছিলেন। চারিদিকে গোয়েন্দা ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়াও তিনি নিজেও সে অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের মুসলিমদের ব্যাপারে প্রশ্ন করছিলেন। বদর এলাকায় পৌঁছে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি তোমাদের এলাকায় অচেনা কাউকে দেখেছ?" তারা বলল, "দুজন ব্যক্তিকে দেখেছি।" আবু সুফিয়ান বলল, "আমাকে তাদের বাহনের কাছে নিয়ে যাও।" আবু সুফিয়ান সেখানে গিয়ে তাদের উটের মল হাতে নিয়ে দেখলেন ভেতরে খেজুরের বিচি। তিনি সেই বিচি পর্যবেক্ষণ করে বললেন, "আল্লাহর কসম, এ তো ইয়াসরিবের উট!" সাথে সাথে তিনি তাদের সম্পদ ও কাফেলা রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়ে যমযম ইবনে আমর গিফারীকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কায় পাঠালেন এবং তার (আবু সুফিয়ান) কাফেলার ফেরার সাধারণ পথ পাল্টে সমুদ্র উপকূলবর্তী পথ ধরে মক্কার দিকে এগিয়ে গেলেন।যমযম ইবনে আমর কুরাইশদের উত্তেজিত করতে ও পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে উটের নাক কেটে, হাওদা উল্টিয়ে ও নিজের গায়ের জামা দুই দিক থেকে ছিঁড়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিল। চিৎকার করে সে বলছিল, "তোমাদের কাফেলা, তোমাদের কাফেলা! আবু সুফিয়ানের সাথে থাকা তোমাদের সম্পদের উপর মুসলিমরা হামলা করেছে। হয়তো তোমরা তোমাদের সম্পদ হারাতে যাচ্ছ। সাহায্য করো, সাহায্য করো!" কাফেলা বিপদে পড়ার খবর শুনে কুরাইশ নেতারা ক্রোধে ফুঁসে উঠল। এটি ছিল তাদের উদ্ধত্য এবং অহমিকার উপরে যেমন আঘাত তেমনি তাদের অর্থনীতির জন্য হুমকিস্বরূপ। কাফেলা রক্ষা করার জন্য তারা দিশেহারা হয়ে তাদের পূর্ণ সামরিক শক্তি নিয়ে বদর অভিমুখে রওনা দিল। ইবনে ইসহাক এর বর্ণনামতে, কুরাইশ বাহিনীতে ছিল ১০০ এর বেশী ঘোড়া, ৬০০ বর্ম পরিহিত সৈন্য ও ৫০০ এর বেশী উট। ওদিকে আবু সুফিয়ান বিপজ্জনক এলাকা অতিক্রম করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে কুরাইশ নেতাদের কাছে খবর পাঠাল যে- 'কাফেলা রক্ষা পেয়েছে, আপনারা মক্কায় ফিরে যান'। কিন্তু এর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। তাদের অধিকাংশই মুসলিমদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে অবস্থান নিল। তাদের যুক্তি ছিল, মুসলিমদের উপর আক্রমণ করলেই কুরাইশদের ব্যবসার পথ ভবিষ্যতের জন্য নিরাপদ হবে এবং অন্য গোত্রগুলোর ওপর এর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবে। যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে কুরাইশদের প্রধান নেতৃত্ববৃন্দ সকলেই একমত হল ও রওনা দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

নবীজি ﷺ এর সাহাবীদের সাথে মাশোয়ারা :

নবীজি ﷺ যখন জানতে পারলেন আবু সুফিয়ান নাগালের বাইরে চলে গেছে এবং মক্কার নেতারা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসছে তখন তিনি পরামর্শের জন্য সাহাবীদের একত্রিত করলেন। কিছু সাহাবী যুদ্ধের পক্ষে মত দিলেন আর কিছু সাহাবী কুরাইশদের মুখোমুখি হতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

"যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না। তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হবার পর; তারা যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে। আর যখন আল্লাহ দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোনরকম কণ্টক নেই, তাই তোমাদের ভাগে আসুক; অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে। যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয়।" (সূরা আনফাল, ৮:৫-৮)

এরপর রাসূল বললেন, "হে লোকসকল, আমাকে পরামর্শ দাও"। তিনি এখানে আনসারদের মত জানতে চাচ্ছিলেন। কারণ, তাঁরাই ছিলেন সেনাবাহিনীর অধিকাংশ এবং আকাবার দ্বিতীয় বায়য়াত অনুযায়ী মদিনার বাইরে রাসূল কে রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায় না। আনসারদের পতাকাবাহী সা'দ বিন মুয়ায কথা শুনতে চাচ্ছেন"। রাসূল নবীজির উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললেন, "আপনি বোধহয় আমাদের বললেন, "হ্যাঁ"। তখন তিনি বললেন, "আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি, আপনাকে সত্যায়ন করেছি, সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা সবই সত্য এবং আমরা আপনার আনুগত্যের শপথ করেছি। আপনি আপনার লক্ষ্যে এগিয়ে যান। হে আল্লাহর রাসূল, আপনাকে যিনি সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন সেই রবের শপথ, যদি আপনি আমাদের নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন তবে আমরাও আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমাদের একজনও পিছিয়ে থাকবে না। আপনি চাইলে আমাদের নিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হন, আমরা যুদ্ধে ধৈর্যশীল থাকব। আক্রমণের মুখে আমরা জোয়ানী ও তেজোদীপ্ত পৌরুষের প্রমাণ দিব। যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে এমন কিছু দেখাবেন যা আপনার চোখ শীতল করবে। সুতরাং আপনি যেখানে ইচ্ছা আমাদের নিয়ে চলুন। আল্লাহ আমাদের কাজকর্মে বরকত দান করুন।" আল্লাহর রাসূল তাঁর

কথা শুনে ভীষণ খুশি হলেন। তিনি বললেন, "এগিয়ে যাও এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর।নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে দু'দলের মধ্য থেকে একটি অঙ্গীকার করেছেন। আল্লাহর কসম! আমি যেন এখনই সেই কওমের বধ্যভূমি দেখতে পাচ্ছি।"

গায়েবী সাহায্য:

আল্লাহ তাঁর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করলেন সে রাতেই। মক্কা বাহিনীর উপরে বৃষ্টি বর্ষিত হল মুষলধারার মত। তাদের পায়ের নিচের মাটি কাদায় পরিণত হলো। আর সেই বৃষ্টির পানিতে মুসলিম বাহিনী হয়ে গেল পবিত্র।

মুসলমানদের অঙ্গীকার :

যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত এক হাজার সৈন্যের মোকাবেলায় সাজ-সরঞ্জামহীন ৩০০ জন মুজাহিদ মুখোমুখি হন। এমন অবস্থায় একজন মানুষও যুদ্ধে শরিক হতে চাইলে কত বড় উপকার হতো! কিন্তু ইসলাম ধর্মে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বদর যুদ্ধের ময়দানে হুযাইফা রা. ও আবু হুসাইল রা. যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে এসে তাদের কাহিনী বর্ণনা করেন যে, এখানে আসার পথে কুরাইশরা তাদেরকে আটক করে জানতে চায়, 'তোমরা কি মুহাম্মাদের সাহায্যার্থে যাচ্ছ?' তারা অস্বীকার করেন। তখন কুরাইশরা তাদেরকে যুদ্ধে শরিক না হওয়ার অঙ্গীকার করায়। নবীজি এই অঙ্গীকার সম্পর্কে জানতে পেরে এ দুজনকে যুদ্ধে অংশ নিতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, 'আমরা সর্বাবস্থায় ওয়াদা রক্ষা করব। আল্লাহর সাহায্যই আমাদের জন্য যথেষ্ট।'

দুই পক্ষ সারিবদ্ধভাবে মুখোমুখি হলে কুরাইশদের তিন বাহাদুর যোদ্ধা এগিয়ে আসে উতবা, শাইবা ও ওয়ালিদ। মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের মোকাবেলা করেন আলী রা., হামযা রা. ও উবাইদা বিন হারিস রা.। কাফের তিনজন নিহত হয়, মুসলমানদের শুধু উবাইদা রা. আহত হন। আলী রা. তাকে কাঁধে তুলে নবীজির কাছে নিয়ে আসেন। নবীজি তার মাথা নিজ পায়ের ওপর রেখে তাকে শুইয়ে দেন এবং তার চেহারার ধুলোবালি নিজ হাতে মুছে দেন। উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষ নিঃশ্বাস যখন ত্যাগ করেন নবীজি কে জিজ্ঞেস করেন আমি কি শাহাদাতের ফজিলত থেকে বঞ্চিত হব। আল্লাহর নবীর উত্তর দেন, তুমি শহীদ এ ব্যাপারে আমি সাক্ষী থাকলাম। উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পর নবীজির স্বয়ং তার কবরে অবতরণ করেন এবং নিজ হাতে তাকে সমাহিত করেন।

সাহাবীদের ত্যাগ :

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অনেক আত্মীয় যারা সাহাবীদের তরবারির নাগালে চলে আসে। কিন্তু তারা ঈমানের উপরে এত বেশি দৃঢ় ছিল যে সেখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক ও ম্লান হয়ে যায়। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পুত্র যে তখনও মুসলমান হয়নি ময়দানে এলে স্বয়ং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তরবারি নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হন। উদবা সামনে এলে তার পুত্র হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তরবারি খাপ মুক্ত করে তার দিকে এগিয়ে যান। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মামাকে রণক্ষেত্রে দেখতে পেয়ে তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হন। তুমুল লড়াই শুরু হয় ময়দানের যুদ্ধ চলছিল আর নবীজি সেজদায় পড়েছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছিলেন।

ফেরেশতাদের যুদ্ধ :

বদর যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা সরাসরি প্রথমে ১০০০, এরপর ৩০০০ এবং সবশেষে ৫০০০ ফেরেশতা নাযিল করে মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করেন। তবে কোন কোন বর্ণনামতে, আল্লাহ শুধু ১০০০ ফেরেশতা নাযিল করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন সূরা আনফালের ১২ নং আয়াতে, সূরা আলে ইমরানের ১২৪ ও ১২৫ নং আয়াতে।

"(স্মরণ কর), যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে ওহীর মাধ্যমে হুকুম দিলেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। কাজেই তোমরা মুমিনদের পা স্থির রাখ, আমি কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চার করব। সুতরাং তোমরা তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত কর এবং তাদের আঙ্গুলের জোড়াসমূহেও আঘাত কর।"(সূরা আনফাল, ৮:১২)

আবু উসাইদ সায়েদী বলেন, "বদর যুদ্ধের দিন ফেরেশতারা গৌর বর্ণের পাগড়ি পরিহিত ছিলেন এবং পাগড়ির শেষ প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝে ছেড়ে দেওয়া অবস্থায় ছিল।"

যুবায়ের ইবনুল আওয়াম বদর যুদ্ধের দিন গৌর বর্ণের পাগড়ি পরে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন। সকল ফেরেশতারা তাঁর অনুকরণে গৌর বর্ণের পাগড়ি পরে নেমে আসে। নিঃসন্দেহে এটি তাঁর জন্য এক বিরল সম্মান ইবনে আব্বাস বলেন, বদর যুদ্ধে জনৈক মুসলিম মুজাহিদ একজন মুশরিক সেনার পিছু ধাওয়া করছিলেন। হঠাৎ তিনি সেই মুশরিক সৈনিকের উপর চাবুকের আঘাত শুনতে পেলেন এবং তার পাশাপাশি একজন অশ্বারোহীর কণ্ঠস্বর শুনলেন। তিনি বলছিলেন, "হাই জুম! (ফেরেশতার বাহনের নাম) এগিয়ে যাও।" সাথে সাথে ওই মুশরিক মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। তিনি দেখলেন তার

নাক-মুখ মন্ডল থেকে রক্ত বের হচ্ছে যেন কেউ তাকে বিষাক্ত চাবুক দিয়ে আঘাত করেছে। ওই আনসারী সাহাবি রাসুল কে ঘটনাটি জানালে রাসুল ﷺ বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ, তিনি ছিলেন তৃতীয় আকাশ থেকে অবতরণকারী ফেরেশতা।(সহিহ মুসলিম)

ইবনে আব্বাস থেকে আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। রাসুল বদর যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, "এই হলেন জিবরীল। তিনি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিজের ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে আছেন।"(সহিহ বুখারী)

আলী বর্ণনা করেছেন, আনসারী গোত্রের এক সাহাবি বদর যুদ্ধের দিন আব্বাসকে গ্রেফতার করে আনেন। আব্বাস বলছিলেন, "আল্লাহর শপথ, সে আমাকে গ্রেফতার করেনি। আমাকে অনিন্দ্য সুন্দর চেহারার এক লোক গ্রেফতার করেছেন। যার মাথার দিকে কোনো চুল ছিল না এবং তিনি ছিলেন ধূসর বর্ণের ঘোড়ার আরোহী। আমি উপস্থিত লোকদের মাঝে তাকে দেখছি না"।

অবশেষে বিজয় :

বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর স্পষ্ট বিজয় অর্জন করে। মুশরিকদের ৭০ জন নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দি হয়। আর মুসলিম বাহিনীর ১৪ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করে তাদের মধ্যে ছিলেন ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনসার। যুদ্ধের পর রাসূল ﷺ মুশরিকদের ২৪ জন সর্দারের লাশ বদরের নোংরা, অপবিত্র ও দুর্গন্ধময় কুয়ায় ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। ৭০ জনের মধ্যে বাকিদের লাশ অন্য কুয়ায় ফেলে দেয়া হয়। তিন দিন অতিক্রান্ত হলে ২০ রমযান রাসূল বদর প্রান্তর থেকে রওনা দিলেন। ফিরে আসার সময় তিনি ২৪ জন সর্দারের লাশ যে কুয়ায় ফেলা হয়েছিল তার নিকটে গিয়ে তাদের প্রত্যেককে 'অমুক ইবনে অমুক' বলে ডাকলেন এবং বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা তোমাদের ভালো লাগেনি। আমাদের প্রতি আমাদের রব যে ওয়াদা করেছেন আমরা তা সঠিক ও সত্য হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছি। তোমাদেরকে যে অঙ্গীকার প্রদান করা হয়েছে তা তোমরা সত্য হিসেবে পেয়েছ কি?"

একথা শুনে উমার রা: বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি প্রাণহীন কতগুলো রাসূল ﷺ বললেন, "ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা আমার কথা তাদের চেয়ে বেশি শুনতে পাও না। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, তারা কথার জবাব দিতে পারে না।" চূড়ান্ত বিজয়ের পর রাসূল ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা জায়েদ বিন হারিসা

রা: মদিনাবাসীর নিকট সুসংবাদ প্রদানের জন্য মদিনার উচ্চ এলাকায় কে এবং নিম্ন এলাকায় এবং জায়েদ বিন হারিসা রা: কে পাঠালেন। রাসূল সা: এর উট কসওয়ার পিঠে চড়ে তাকবীর দিতে দিতে মদিনায় প্রবেশ করলেন। মদিনাবাসী তার চারপাশে জড়ো হলে তিনি কুরাইশদের নিহত নেতাদের নাম বলতে লাগলেন আর মুসলিমরা আনন্দ ও আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন। এই সুযোগে কিছু মুনাফিক রটিয়ে দিল যে, রাসূল ﷺ নিহত হয়েছেন আর তাই জায়েদ বিন হারিসা রাসূল ﷺ এর উটে চড়ে মদিনায় এসেছেন।

বদর যুদ্ধের বিজয়ের সংবাদ যেদিন মদিনায় প্রবেশ করে সেদিন আরেকটি বিষাদময় ঘটনা ঘটে। রাসূল সা:এর প্রিয় কন্যা ও উসমান রা: এর স্ত্রী রুকাইয়া ইন্তিকাল করেন। বিজয়ী মুসলিম বাহিনী যখন মদিনায় প্রবেশ করছে তখন মাত্র রুকাইয়া এর দাফন-কাফন সম্পন্ন হয়েছে। তাই রাসূল সা: এর জন্য এই দিন ছিল আনন্দ ও কন্যা হারানোর কষ্টের দিন। আল্লাহ যেন মুসলিমদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, এই দুনিয়া চিরস্থায়ী সুখের বা আনন্দের জায়গা নয়।

আবু জাহেল এর মৃত্যু :

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি ছিলাম যুদ্ধের সারিতে। আমার ডানে বাঁয়ে দেখলাম দুজন অল্প বয়সি আনসার কিশোর। [তারা দুজন হলো- মুয়াজ (ভিন্ন বর্ণনায়- মুআওয়িজ) ইবনে আফরা ও মুয়ায ইবনে আমর ইবনে জামুহ] আমি ভাবলাম, আমার পাশে শক্তিশালী দুজন যোদ্ধা থাকলে খুব ভালো হতো। তাদের একজন আমাকে বলল, "চাচাজান আপনি কি আবু জাহল কে চেনেন?" আমি বললাম, "তোমরা তার কী করবে?" সে বলল, "আমি শুনেছি সে রাসূল - এর ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করে। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমি যদি তাকে দেখতে পাই তবে হয় আমি মারা যাবো অথবা সে মারা যাবে"। আমি তার কথায় আশ্চর্য হলাম। দ্বিতীয়জনও আমাকে একই কথা বলল। তখনই আমি আবু জাহলকে দেখলাম সে লোকজনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি তাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। তারা সাথে সাথে নিজের তরবারি নিয়ে ছুটল এবং তাকে আঘাত করে বসল। অতঃপর রাসূল এর কাছে গিয়ে এই খবর জানানো হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে?" তারা উভয়ে দাবি করল যে সে-ই তাকে হত্যা করেছে। তখন রাসূল তাদের উভয়ের তরবারি দেখেন এবং বলেন, "তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ।"

অবশ্য তার নিকট হতে প্রাপ্ত মালামাল মুআয ইবনে আমর ইবনে জামুহকে দেওয়া হলো। মুআয বিন আমর বিন জামুহ বর্ণনা করেছেন, "যখন আমি আবু জাহলকে আঘাত করলাম (এই আঘাতের ফলে তার পা দ্বিখণ্ডিত হয়ে খুলে পড়ে যায়) অন্য দিকে তখন তার পুত্র ইকরিমা আমার কাঁধে তরবারির আঘাত করল এবং তাতে আমার হাত কেটে গিয়ে চামড়ার সঙ্গে ঝুলে থাকল এবং যুদ্ধের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। আমি সেটি পিছনে টেনে নিয়ে সাধারণভাবে যুদ্ধ করতে থাকলাম। কিন্তু সে যখন আমাকে খুবই কষ্ট দিতে লাগল তখন আমি তার উপর আমার পা রেখে জোরে টান দিয়ে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম।" রাসূল ﷺ বললেন, "আবু জাহলের কী অবস্থা তোমরা কি একটু দেখে আসবে?" - একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ দেখতে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন, সে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে। তখন তিনি তার দাড়ি ধরে বললেন, "তুমি কি আবু জাহল?" উত্তরে সে বলল, "সেই লোকটির চেয়ে উত্তম আর কেউ আছে কি যাকে তার গোত্রের লোকেরা হত্যা করল?" অথবা বলল, "তোমরা যাকে হত্যা করেছ।"

ভিন্ন বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি বদরের দিন আবু জাহলকে আহত অবস্থায় দেখে তাকে বললাম, "হে আল্লাহর শত্রু, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। উত্তরে সে বলল, "আমাকে কীভাবে লাঞ্ছিত করেছেন? তোমরা যাকে হত্যা করেছ তার চেয়ে সম্মানিত আর কে আছে?" আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, "আমার কাছে তরবারি ছিল। আমি তাকে হত্যা করতে অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলাম তার ধারালো তরবারি তার হাতে মুষ্টিবদ্ধ। আমি তার হাতে আক্রমণ করলে তার হাত থেকে তা পড়ে গেল। অতঃপর আমি তার শিরস্ত্রাণ খুলে ফেললাম এবং তার দাড়ি ধরে তার শিরশ্ছেদ করে ফেললাম। এরপর রাসূল কে তার কর্তিত মাথা নিয়ে গিয়ে দেখালে রাসূল তাঁর মৃতদেহ দেখতে চাইলেন। আমি তাঁকে তাও দেখালাম। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, "সে হচ্ছে এই উম্মতের ফেরাউন" এবং তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন ও আবু জাহলের তরবারিটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে দিয়ে দিলেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ শেষ মুহূর্তে আবু জাহলের শিরশ্ছেদ করতে চাইলে সে বলে উঠল, "হে রাখাল, তুমি তো খুব উঁচু স্থানে উঠে গেছো।" উল্লেখ্য, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ মক্কায় ছাগল চরাতেন। এজন্য তাঁকে আবু জাহল রাখাল বলে সম্বোধন করেছিল।

উমাইয়া ইবনে খালাফের লাশ অত্যধিক ফুলে যায়। একারণে লাশের গা থেকে বর্ম খুলতে গিয়ে লাশটি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। সে স্থানেই লাশটি মরুভূমির তপ্ত পাথর দিয়ে চাপা দেওয়া হয়। এটাই আল্লাহর তাকদীর- যে তপ্ত মরুভূমির পাথরে তিনি একদিন বিলাল কে চাপা দিতেন সেই পাথরের নিচেই তার খণ্ড-বিখণ্ড মৃতদেহ চাপা পড়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ!

আলী রাঃ ও ফাতিমাহ রাঃ এর বিয়ে:
দ্বিতীয় হিজরিতে (মাসের ব্যাপারে মতভেদ আছে- যিলহাজ্ব/মুহাররাম/সফর) রাসূল তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা ফাতেমার সাথে আলীর বিবাহ দেন। প্রথমে আবুবকর এবং উমর এই সৌভাগ্য লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু রাসূল ﷺ চুপ থাকেন। অতঃপর আবু বকরের পরামর্শক্রমেই আলী রাসূল ﷺ কে এই প্রস্তাব দিলে রাসূল ﷺ তা মঞ্জুর করেন। ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে, আলী সরাসরি প্রস্তাব দিতে লজ্জা পাচ্ছিলেন বিদায় তিনি ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। রাসূল অভিপ্রায়ের কথা জিজ্ঞেস করলে আলী তা স্বীকার করেন এবং রাসূল করেন। এই বিয়ের মোহরানা হিসেবে বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত বর্মটি আলী তা বুঝতে পেরে তার তাঁর এই ইচ্ছা মঞ্জুর ফাতেমা কে দিয়ে দেন। ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে, এই বর্মটি উসমানের কাছে ৪৮০ দিরহামে বিক্রি করে প্রাপ্ত সম্পত্তি নিয়ে আলী রা: রাসূল সা: এর কাছে হাজির হন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এর মধ্যে থেকে সুগন্ধি ও পোশাক ক্রয় করে নাও। তিনি তার প্রাণপ্রিয় কন্যার বিয়েতে উপহার হিসেবে একটি লেপ,একটি বালিশ, দুটি চাক্কি অর্থাৎ যাতা,একটি মশক এবং দুটি মাটির কলসি উপহার দেন।

বনু কাইনুকা অভিযান

একদিন এক মুসলিম মহিলা বনু কাইনুকার বাজারে দুধ বিক্রি করে কোন প্রয়োজনে এক ইহুদী স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে বসেছিলেন। কয়েকজন ইহুদী সেই মহিলাকে তার মুখের নেকাব খোলার জন্য জোরাজুরি করছিল, কিন্তু মহিলা তা করতে অস্বীকার করে। এ সময় স্বর্ণকার গোপনে মহিলাটির কাপড়ের এক প্রান্ত মাটির সাথে আটকে দিয়েছিল কিন্তু তিনি তা বুঝতে পারলেন না। তিনি যখন উঠতে গেলেন তখন পেরেকে আটকে

তার সমস্ত কাপড় খুলে পড়ল। ভদ্রমহিলাকে এই অবস্থায় দেখে উপস্থিত লোকজন হাততালি দিয়ে হাসাহাসি করতে থাকল। তখন মহিলাটি আর্তনাদ করতে থাকলেন। এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত এক মুসলিম ইহুদী স্বর্ণকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করল। জবাবে ইহুদীরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করল। তখন ঐ নিহত মুসলিম ব্যক্তির পরিবার নবীজির কাছে গিয়ে ঘটনার বিচার দিলেন। সবকিছু শুনে রাসূল সা:-এর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি একটি পরিপূর্ণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করলেন এবং হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করে পতাকা দিলেন। আবু লুবাবাকে মদিনার ভারপ্রাপ্ত আমীর নিযুক্ত করলেন। এরপর দ্রুতবেগে সেনাবাহিনী নিয়ে বনু কাইনুকার দুর্গের দিকে রওনা দিলেন এবং সেখানে পৌঁছে দুর্গের সমস্ত প্রবেশপথ বন্ধ করে দিলেন। রাসূল সা: ১৫ দিন পর্যন্ত কঠিনভাবে তাদের দুর্গ অবরোধ করে রাখলেন। অবশেষে ইহুদীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করল এবং তাদের ব্যাপারে রাসূল সা:-এর ফয়সালা মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার করল। রাসূল সা:-এর নির্দেশে তাদের সকলকে বেঁধে রাখা হলো।

ইহুদীদের এই অবস্থা দেখে মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই রীতিমতো কষ্টে পড়ে গেলেন। তিনি রাসূল সা: কে অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় করে তাদের ক্ষমা করতে বললেন কিন্তু তিনি কিছুতেই তাতে রাজি হলেন না। অবশেষে সে বলল, "তাদের ৪০০ জন যুবক বর্মহীন এবং ৩০০ জন যুবক বর্মপরিহিত। তাদেরকে আপনি একই দিনের সকালবেলা হত্যা করে ফেলবেন অথচ তারা আমাকে কঠিন বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিল। আল্লাহর কসম, আমি কালচক্রের বিপদের আশঙ্কা করছি।" এই ঘটনার এক মাসেরও কম সময় পূর্বে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বাহ্যিকভাবে কালিমা পাঠ করেছিল।

রাসূল সা: তার অনুরোধে হত্যা করার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকলেন। তবে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাদেরকে তিন দিন সময়ের মধ্যে মদিনা ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং যাওয়ার সময় তাদের কাছ থেকে যুদ্ধের গনীমত হিসেবে তাদের যাবতীয় সম্পত্তি নিয়ে নিলেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা রা: গনীমত একত্রিত করার কাজ করেন। গনীমতের সম্পদ থেকে তিনটি কামান, দুটি বর্ম, তিনটি তরবারি এবং তিনটি বর্শা ও গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ রাসূল সা: নিজের জন্য রেখে বাকিটা সাহাবীদের মধ্যে ভাগ করে দেন।

ইহুদীদের নির্বাসনের আদেশ পরিবর্তনের জন্য আবারও আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই চেষ্টা শুরু করে। সে রাসূল সা: এর সাথে দেখা করার জন্য তাঁর ঘরে গেলে রাসূল সা: এর

দ্বাররক্ষী উয়াইম ইবনে সায়িদাহ তাকে ভেতরে যেতে দেয়নি। এক পর্যায়ে ধাক্কাধাক্কি হয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই দেয়ালের সাথে আঘাত পেলে তার চেহারা রক্তাক্ত হয়ে যায়। ভগ্ন মনে সে সেখান থেকে ফিরে যায়।

নির্বাসন প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করার জন্য উবাদা বিন সামিত রা: কে নিযুক্ত করা হয়। বনু কাইনুকাহর সাথে জাহেলী যুগে তাঁর মিত্রতা ছিল। বনু কাইনুকাহ তাঁকে সেই মিত্রতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি দ্বিধাহীনভাবে সেই মিত্রতা ছিন্ন করার ঘোষণা দিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা: এর সাথে মিত্রতার ঘোষণা দিলেন। বনু কাইনুকাহকে ৩ দিন সময় দেওয়া হয়েছিল মদিনা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। ৩ দিন পর তারা আরও কিছু সময় চাইলে উবাদা বিন সামিত রা: তা নাকচ করে দেন এবং তাদেরকে সিরিয়ার আজরাআত নামক স্থান পর্যন্ত রেখে আসেন। এই অভিযান সংঘটিত হয়েছিল ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে।

উহুদ যুদ্ধের পূর্বে পরিচালিত গাযওয়া এবং সারিয়া সমূহ:

১। গাযওয়ায়ে কুদর:

বদর যুদ্ধের দিন সাতেক পর দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে রাসূল সাঃ-এর নিকট খবর আসে যে, বনু গাতফান এবং শাখাগোত্র বনু সুলাইম মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন নবীজি তাদের শায়েস্তা করার জন্যে ২০০ উষ্ট্রারোহী সৈন্য নিয়ে তাদের বাসভূমিতে যান। কুদর নামক স্থানে পৌঁছানোর পর বনু সুলাইম পালিয়ে যায় এবং তাদের পাঁচশ উট ও একটি গোলাম রেখে যায়। রাসূল সাঃ গোলামটি কে আযাদ করে দেন আর উটগুলো সাহাবিদের মাঝে ভাগ করে দেন। সেখানে ৩ দিন অবস্থানের পর রাসূল সাঃ বাহিনী নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

২। গাযওয়ায়ে সাভীক:

আবু সুফিয়ান বদরের যুদ্ধের লজ্জাকর পরাজয়ের পর পুনরায় মুসলিমদের সাথে লড়াই করার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। সে শপথ করে যে, মুসলিমদের উপযুক্ত প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত সে জানাবাতের গোসল করবে না। সে প্রায় দুইশ অশ্বারোহী নিয়ে মদিনা আক্রমণের জন্যে রওনা হয় এবং সাইব নামক স্থানে তাবু স্থাপন করে। সে মদীনায়

হুয়াই বিন আখতাবের বাড়িতে রাত্রিযাপনের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন না। এরপর সে বনু নাযীরের সাল্লাম ইবনু মিশকাম এর বাড়িতে রাত্রিযাপন এবং মদ্যপান করে। ভোরবেলা সরাসরি মদিনা আক্রমণের সাহস না পেয়ে আবু সুফিয়ান তার বাহিনীকে মদিনার আশেপাশের এলাকায় ডাকাতি-লুণ্ঠন শুরু করার নির্দেশ দেয়। তার দল মদিনার পার্শ্ববর্তী উরাইয নামক বস্তিতে আক্রমণ করে, কিছু খেজুর গাছ কেটে ফেলে এবং আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এ সময় তারা একজন আনসার ও তার মিত্রকেও হত্যা করে মক্কায় ফিরে আসে।

রাসূল সাঃ এ খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনযির রাঃ এর কাছে মদিনার দায়িত্ব দিয়ে সাহাবিদের একটি দল নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান তার আগেই পালিয়ে যায় এবং পালানোর সুবিধার্থে অনেক 'সাভীক' অর্থাৎ ছাতু ফেলে রেখে যায়। নবীজি 'কুরকুরতুল কুরাদ' নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে আবার মদিনায় ফিরে আসেন। এ সময় তারা যে ছাতু ফেলে গিয়েছিল তা মুসলমানেরা তুলে আনে। এভাবে এ যুদ্ধের নাম হয় 'গাযওয়ায়ে সাভীক' বা 'ছাতুর যুদ্ধ'।

৩। গাযওয়ায়ে যূ আমর:

তৃতীয় হিজরীর মুহাররম মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বদর ও উহুদের যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এটিই ছিল সবচেয়ে বড় সামরিক হামলা। নবীজির কাছে খবর পৌঁছায় বনু সালাবা ও বনু মুহারেবের এক বিশাল সেনাবাহিনী মদিনার আশেপাশের এলাকা আক্রমণের জন্যে একত্রিত হয়েছে। এ খবর শুনে রাসূল সাঃ ৪৫০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মদিনা থেকে রওনা দেন। এ সময়ে মদিনায় দায়িত্ব দিয়ে যান উসমান ইবনে আফফান রাঃ এর কাছে।

পথে সাহাবীগণ বনু সালামা গোত্রের জুব্বার নামক এক ব্যক্তিকে আটকে করে রাসূল সাঃ এর কাছে নিয়ে আসেন। তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং সে মুসলিম হয়ে যায়। তার পথ নির্দেশনামতো মুসলিমরা শত্রুবাহিনীর ভূমি পর্যন্ত পৌঁছায়। শত্রুরা মদিনা বাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে বিভিন্ন গুহায় লুকিয়ে পড়ে। রাসূল সাঃ তাঁর বাহিনী নিয়ে শত্রুদের সমবেত হওয়ার স্থানে পৌঁছান। সেখানে 'যূ আমর' নামে একটি প্রস্রবণ ছিল। তারা সেখানে ৩য় হিজরীর পুরো সফর মাস বা তার কিছু সময় অতিবাহিত করেন যেন বেদুঈন যাযাবর জাতিদের অন্তরে মুসলিমদের ব্যাপারে ত্রাসের সৃষ্টি হয়।

৪। গাযওয়ায়ে বুহরানঃ

৩য় হিজরীর রবীউস সানী মাসে বাহরানের দিকে প্রায় ৩০০ যোদ্ধা নিয়ে রাসূল সাঃ বুহরান অঞ্চলে (হিজাযের ভেতর ফুর'য়া সীমান্তে এক খনিজস্থল ভূমি ছিল) এক সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। এতে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। সেখানে তারা পুরো রবীউস সানী এবং জুমাদাল উলা কাটিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন।

হাফসা রা. ও যায়নাব রা.-এর সঙ্গে বিবাহ:

তৃতীয় হিজরির শাবান মাসে হাফসা রা.-এর সঙ্গে এবং রমযান মাসে যায়নাব বিনতে খুযাইমা রা.-এর সঙ্গে নবীজির শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

সারিয়ায়ে যায়েদ ইবনু হারিসা:

এটা ছিল উহুদ যুদ্ধের আগে ৩য় হিজরিতে। কুরাইশরা তখন বদর যুদ্ধের পর খুব বেশি দুশ্চিন্তা গ্রস্ত ছিল। গ্রীষ্মকাল চলে আসে এবং শাম এ তাদের বাণিজ্যের সময় চলে আসে। সেই কাফেলাতে আমীর ছিল সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া। আসওয়াদ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব এর পরামর্শ মতো ইরাকের রাস্তায় সফর করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এই যাত্রার খবর মদীনায় চলে যায়। রসূল ﷺ আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। প্রায় ১০০ অশ্বারোহী একটি বাহিনী তৈরি হয় যার নেতৃত্বে ছিল যায়েদ ইবনু হারিস। যায়েদ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করে এবং কুরাইশরা একেবারেই অসতর্ক অবস্থায় কারদা নামক স্থান এ অবতরণ করে। মুসলিম বাহিনী অতর্কিত হামলা করে কাফেলা দখল করে নেয়। ফুরাত ইবনু হাইয়ান ও দুইজন কে বন্দী করেন। পরবর্তীতে ফুরাত ইবনু হাইয়াত রসূল ﷺ এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন।

উহুদ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের দ্বারা কুরাইশরা পরাজিত হওয়ার পর দ্বিগুণ বেড়ে যায় তাদের ক্ষোভ। মুসলমানদের দ্বারা পরাজিত হওয়ার লজ্জা মেটাতে তারা তাদের নিহতদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগে। এরই ধারাবাহিকতায় তৃতীয় হিজরিতে আবু

সুফিয়ান সাখার বিন হারবের নেতৃত্বে মুসলমানদের মোকাবিলা করতে ৩ হাজার সৈন্য প্রস্তুত করা হয়। অপরদিকে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৭০০-এর কাছাকাছি। মদীনার উত্তর অংশে অবস্থিত উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে কুরাইশদের সেনাবাহিনী পৌঁছে তাবু তৈরি করে নেয়। মুসলমানরা উহুদ পাহাড়কে পেছনে রেখে একটি টিলায় অবস্থান করে। শুরু হয় কুরাইশ ও মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধ। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় যদিও মুসলমানদের সাময়িক বিজয় ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে মুশরিকদের দ্বারা পুনর্বার আক্রমণ তাদেরকে পরাজিত হতে বাধ্য করে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে থেকে ৭০ জন সাহাবী শহিদ হন। হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব (রা.) শহিদদের মধ্যে একজন। এ-যুদ্ধে রাসূল ﷺ আহত হন। তখন উপস্থিত সাহাবীদেরকে এ-সংবাদ দিয়ে দুর্বল করে দেওয়া হয় যে, রাসূলকে হত্যা করা হয়েছে।

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ ছিল বেশ কিছু তীরন্দাজ মুজাহিদ কর্তৃক রাসূলের (সা.) নির্দেশ লঙ্ঘন। রাসূলের (সা.) নির্দেশ ছিল, জয় অথবা পরাজয় কোনো অবস্থাতেই মুসলিম তীরন্দাজ-বাহিনী যেন পাহাড়ে তাদের অবস্থান পরিত্যাগ না করে। কারণ, তাতে মুসলিম-বাহিনীর পেছনের অংশ শত্রুর জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বিজয় নিজেদের অর্জিত হয়ে গেছে মনে করে মুসলিম-বাহিনী রাসূলের আদেশ লঙ্ঘন করায় তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এ-সুযোগে মুশরিকরা মুসলমানদেরকে পেছন থেকে আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়। নেতার আদেশ লঙ্ঘন ও শৃঙ্খলার অভাবই ছিল উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের প্রধান কারণ। মুসলমানদের এই পরাজয়ে কুরাইশরা তাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কায় ফিরে যায়। এ-যুদ্ধে তাদের ২৪ জন সৈন্য নিহত হয়।

উহুদ যুদ্ধে মহান আল্লাহ মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে দেন। রাসূল (সা.) সাহাবীদেরকে নিয়ে উহুদ-প্রান্তে আগমনকালে ৩০০ মুনাফিক পেছনে সরে যায়। যুদ্ধের সেনাপতি রাসূলের (সা.) আদেশ না-মানার ফলে মুশরিক-বাহিনী কর্তৃক হঠাৎ আক্রমণ করে যে-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তাতে মুসলমানদের জন্যে বহু শিক্ষা রয়েছে।

মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা ও প্রস্তুতি:

রাসূল তার সেনাবাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করেন:

১। মুহাজির বাহিনী এর পতাকা দেওয়া হয় মুসআব বিন উমায়েরকে।

২। কবীলায়ে আউসের আনসার বাহিনীর পতাকা দেওয়া হয় উসাইদ বিন হুযাইর এর হাতে।

৩। কবীলায়ে খাযরাজের আনসার বাহিনীর পতাকা দেওয়া হয় হুবাব ইবনে মুনযির এর হাতে।

মুসলিমদের সেনাবাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০০০। তাদের মাঝে ১০০ জন ছিলেন বর্ম পরিহিত এবং ৫০ জন ছিলেন ঘোড়সওয়ার। অবশ্য মুসা ইবনে উকবা জোর দিয়ে বলেছেন, উহুদের যুদ্ধে মুসলিমগণের সাথে কোন ঘোড়াই ছিল না। ওয়াকিদি বলেন, শুধুমাত্র দুটি ঘোড়া ছিল। একটি রাসুল ﷺ কাছে, আরেকটি আবু বুরদাহ রা: এর কাছে। মদিনায় সালাত পড়ানোর ইমাম হিসেবে নিযুক্ত করা হয় আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে সাদ বিন মুয়াজ এবং সাদ বিন উবাদা রা: বর্ম পড়ে রাসুলের আগে আগে চলছিলেন। সানিয়াতুল বিদা থেকে এগিয়ে গিয়ে তারা একটি বাহিনী দেখতে পান তারা অত্যন্ত উত্তম অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেখানে অবস্থান করছিল। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলে তারা খাযরাজের মিত্র ইহুদি। তারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চায় কিন্তু নবিজি যুদ্ধে কোন কাফিরের সহায়তা নিতে চান না।

এবং রাসুল সাঃ চেয়েছিলেন উহুদ পাহাড় কে পিছনে রেখে এবং মদীনাকে সামনে রেখে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে। তাই শত্রুবাহিনীকে এড়িয়ে ভিন্ন পথে উহুদ পাহাড়ের সামনে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ওয়াকিদি বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাঃ রাতের প্রথম অংশে ঘুমিয়ে মধ্যরাতে জেগে উঠলেন এবং এরপর উপযুক্ত রাস্তা খুঁজতে তিনি পথপ্রদর্শকদের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি জানতে চাইলেন মুসলিম বাহিনীকে গোপন পথে নিয়ে যেতে পারবে এমন কে আছে? আবু খাইসামা রাঃ বললেন, "আল্লাহর রাসুল! আমি পারবো।" এরপর তিনি রিবরী ইবনে কাইযী নামক এক মুনাফিকের বাগানের ভেতর দিয়ে মুসলিম সেনাবাহিনীকে নিয়ে যান। রাসুল সাঃ ও মুসলিম সেনাবাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে সে মুনাফিক ব্যক্তি তাদের মুখে বালু নিক্ষেপ করতে থাকে এবং বলে, "যদি তুমি রাসুলুল্লাহ সাঃ হও, তাহলে আমার বাগানে প্রবেশ করা তোমার জন্য বৈধ নয়"। ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে, সে নিজের হাতে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে বলে, "হে মুহাম্মাদ! যদি আমি পারতাম তাহলে এই মাটি তোমার মুখে নিক্ষেপ করতাম"। একথা শুনে সাহাবীরা তাকে হত্যা করতে চাইলে রাসুল সাঃ নিষেধ করলেন এবং বললেন, "তোমরা তাকে হত্যা করো না কারণ তার দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি কোনোটাই নেই"।

সমবয়সী কিশোরদের আগ্রহ:

মদীনা থেকে বের হয়ে সৈন্যদের যাচাই-বাছাইয়ের সময় কমবয়সী ছেলেদের ফেরত পাঠানো হয়। কিন্তু কিশোরদের মধ্যে জিহাদের জযবা এত বেশি ছিল যে, রাফে বিন খাদিজকে যখন বলা হয়, 'তোমার বয়স কম, তুমি ফিরে যাও', তখন তিনি পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে দাঁড়ান, যাতে তাকে লম্বা মনে হয়। ফলে তাকে বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমবয়সী সামুরা বিন জুনদুব তাকে বাহিনীতে নিতে দেখে বললেন, ‘আমি তো রাফের সাথে লড়াইয়ে তাকে আছাড় দিতে পারি। তাকে নেওয়া হলে আমাকেও নেওয়া উচিত।' তার কথামতো দুজনকে মোকাবেলার সুযোগ দেওয়া হয়। সামুরা রাফেকে ভূপাতিত করেন। ফলে তাকেও যুদ্ধে নেওয়া হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সঙ্গীদের পলায়ন:

রাসূল (সা.) ও সাহাবীরা মদিনার মধ্যস্থলে যখন পৌঁছান তখন মাগরিবের সময় হয়ে গিয়েছে। রাসূল (সা.) সেখানেই শিবির স্থাপন করে রাত্রিযাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ৫০ জন সাহাবীকে মুসলিম শিবিরে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। তাদের নেতা ছিলেন মুহাম্মদ বিন মাসলামা। যাকওয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু কায়স নির্দিষ্টভাবে রাসূলের পাশে থেকে রাসূলকে পাহারা দিচ্ছিলেন। সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বে রাসূল (সা) পথ চলতে শুরু করেন এবং ‘শাওত' নামক স্থানে পৌঁছে ফজরের সালাত আদায় করেন। এখানে পৌঁছে মুসলিম এবং মুশরিক সেনাবাহিনী একে অপরকে দেখতে পাচ্ছিল। এখানেই মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে তার তিনশ' সৈন্য নিয়ে বলতে শুরু করে, অযথা কেন জীবন দিতে যাব! সে যুক্তি উপস্থাপন করে যে, রাসূল (সা) তার কথা মেনে মদিনার ভেতরে যুদ্ধ না করে অন্যদের কথা মেনে মদিনা থেকে বের হয়েছেন। তাই রাসূলের সাথে সে যুদ্ধ করতে বাধ্য নয়। এই কথা বলে সে ৩০০ জন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মদিনায় ফিরে আসে। তার উদ্দেশ্য ছিল, নিজে প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিরত থাকা এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর মাঝে সন্দেহ এবং ভীতি সৃষ্টি করে দেওয়া। তার এই পরিকল্পনা অনেকটা সফল হতে চলেছিল। কেননা সে চলে আসার পর আওস গোত্রের বনু হারীসা এবং খাযরাজ গোত্রের বনু সালামাহ পিছু হটতে যাচ্ছিল এবং তারা ফিরে যাবার ব্যাপারে চিন্তা করছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের অন্তরের পরিবর্তন ঘটান এবং তারা ফিরে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করে।

যুদ্ধক্ষেত্র:

যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে নবীজি সাহাবীদেরকে সারিবদ্ধ করেন। উহুদ পাহাড় পেছনে থাকায় এদিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। নবীজি ৫০ জনের একটি দলকে পাহাড়ে মোতায়েন করার নির্দেশ দেন, মুসলমানদের জয়-পরাজয় যেটাই হোক না কেন, তারা যেন নিজ স্থান থেকে সরে না যান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তুমুল লড়াই চলতে থাকে। একপর্যায়ে মুসলমানদের বিজয়ের লক্ষণ ফুটে ওঠে। কুরাইশরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পালাতে থাকে। মুসলমানরা গনিমতের সম্পদ জমা করতে শুরু করে। এই পরিস্থিতি দেখে পেছনের পাহাড়ে মোতায়েনকৃত দলটি নিজেদের স্থান ছেড়ে ময়দানে চলে আসে। তাদের নেতা আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের তাদেরকে অনেক নিষেধ করেন। কিন্তু তারা মনে করেন, এখন আর সেখানে অবস্থানের প্রয়োজন নেই এটা ভেবে তাদের অধিকাংশই পাহাড় থেকে নেমে আসেন। মাত্র **১১** জন সেখানে রয়ে যান। খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তখনো মুসলমান হননি। তিনি কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি পেছন দিকের পাহাড় পর্যবেক্ষণ করছিলেন আর সুযোগ খুঁজছিলেন। মুসলমানদের সেখান থেকে সরে পড়তে দেখে তিনি অতর্কিতে আক্রমণ করেন। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের ও তার অবশিষ্ট সঙ্গীরা বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হয়ে যান। ফলে পথ বাধামুক্ত হয়ে পড়ে এবং খালিদ তার বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেন। এতে উভয় পক্ষ এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে পড়ে যে, মুসলমানদের হাতেই মুসলমানরা আঘাতপ্রাপ্ত হতে থাকে। এ সময় মুসআব বিন উমায়ের রা. শহীদ হন। তার চেহারা নবীজির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। এজন্য তার শাহাদাতের পর ভুল সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, নবীজি শহীদ হয়েছেন। কিছু বর্ণনায় আছে, কোনো শয়তান বা কাফের উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলেছিল, 'মুহাম্মদ নিহত হয়েছেন!'

এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই মুসলিম বাহিনীতে হতাশা ছেয়ে যায়। বড় বড় বীর সাহাবীর পা বসে যায়। তবে প্রাণোৎসর্গকারী বেশ কিছু সাহাবী তখনো লড়ে যাচ্ছিলেন। সবার ব্যাকুল দৃষ্টি নবীজিকে খুঁজে ফিরছিল। সবার আগে কাব বিন মালেক রা.-এর দৃষ্টি পড়ে নবীজির দিকে। তিনি খুশিতে চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'মুবারক হোক! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ আছেন!' এ কথা শুনে সাহাবীরা সেদিকে ছুটে যান। কাফেররাও সেদিকে অগ্রসর হয়। তারা কয়েকবার আক্রমণ করে। তবে নবীজি নিরাপদ থাকেন। কাফেররা আক্রমণ করলে নবীজি বলেন, 'আমার জন্য প্রাণোৎসর্গকারী কে আছে?' যিয়াদ বিন সাকান রা. চারজন সঙ্গীসহ এগিয়ে যান এবং

সবাই বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হন। যিয়াদ আহত হয়ে নিচে পড়ে গেলে নবীজি বলেন, 'তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' লোকেরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসে। তখন পর্যন্ত তার শ্বাসপ্রশ্বাস চলছিল। তিনি নবীজির পায়ের ওপর মুখ রাখেন। এ অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়।

হামজা রা. এর শাহাদত:

হামজা রা. অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিলেন এবং তিনি শত্রুবাহিনীর যাকে সামনে পাচ্ছিলেন তাকেই কটুকাটা করছিলেন। ওয়াহশী ইবনে হারব নামে এক গোলাম কাপুরুষের মত পেছন থেকে বর্শা মেরে তাঁকে শহীদ করে।

সে জুবায়ের ইবনে মুতইমের গোলাম ছিল। জুবায়ের চাচা তুয়াইমাহ ইবনে আদীর বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। জুবায়ের বিন মুতইম ওয়াহশীকে বলল, "তুমি যদি মুহাম্মাদ এর চাচা হামজাকে আমার চাচার বিনিময়ে হত্যা করে তবে তোমাকে আযাদ করে দেয়া হবে"। ওয়াহশী তার কথামতো সুযোগ বুঝে পেছন থেকে বর্শা আঘাত করে হামজাকে শহীদ করে দেন। বর্শা হামজা রা. এর নাভির নিচে লাগে এবং দুই পায়ের মাঝ দিয়ে ভেদ করে বের হয়ে যায়। তিনি ওয়াহশীকে ধরা করার ইচ্ছা করেন কিন্তু তার আপাত মাটিতে পড়ে যান। ওয়াহশী হামজা রা. এর দেহ থেকে বর্শা আলাদা করে নিয়ে যায় এবং এরপর তাকে আজাদ করে দেওয়া হয়। সে বধ্যমা নিজের মুজির জন্য হামজা কে হত্যা করতে এসেছিল, আর কারো সাথে তার কোন শত্রুতা ছিল না।

যুদ্ধ শেষে মক্কা ফিরে এলে সে আযাদ হয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের পর তায়েফ থেকে যে প্রতিনিধির ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছিলেন ওয়াহশী তাদের মধ্যে ছিলেন। লোকজন তাঁকে দেখে রাসূল সা. কে ওয়াহশীর আগমনের খবর দিলে তিনি বললেন, "তাকে কিছু বলো না। এক হাজার কাফিরকে হত্যা করার তুলনায় একজন লোকের ইসলাম গ্রহণ করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়"। এরপর রাসূল সা. তার কাছে হামজা রা. কে শহীদ করার ঘটনা সম্পূর্ণ টা শুনলেন এবং বললেন, "যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে আমার সামনে আর এসো না। কারণ, তোমাকে দেখামাত্র আমার অন্তরে চাচার জন্য নতুনভাবে কষ্ট উদয় হয়"। এরপর থেকে সে রাসূল সা. এর মজলিসে সর্বদা রাসূল সা. এর পিঠের পিছনে বসত। পরবর্তীতে ইয়ামামার যুদ্ধে মুসায়লামা কাযযাবকে ঐ একই বর্শা দিয়ে ওয়াহশী হত্যা করে।

রাসূল ﷺ কে আঘাত:

কুরাইশের বিখ্যাত বাহাদুর আবদুল্লাহ বিন কামিয়া সাহাবীদের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যায় এবং নবীজির চেহারায় তরবারির আঘাত হানে। এর ফলে লোহার দুটি কড়া নবীজির চেহারায় বিঁধে যায় এবং একটি দাঁত শহীদ হয়। আবু বকর রা. কড়া বের করতে এগিয়ে আসেন। তখন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. বলেন, 'আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এই খেদমতের সুযোগ দিন।' এরপর তিনি নবীজির কাছে এসে হাতের বদলে নিজ দাঁত দিয়ে লোহার কড়া টেনে বের করেন। প্রথমবার একটি কড়া বের হয়। এর সঙ্গে আবু উবাইদার একটি দাঁত পড়ে যায়। এটি দেখে আবু বকর রা. দ্বিতীয় কড়া বের করতে উদ্যত হন। আবু উবাইদা আগের মতো আল্লাহর দোহাই দিয়ে তাঁকে নিবৃত করেন এবং নিজের মুখ দিয়ে অপর কড়া বের করেন। এতে তাঁর আরেকটি দাঁত পড়ে যায়।

"এজন্য তাঁকে ডাকা হতো দাঁত ভাঙা উত্তম ব্যক্তি।"

এ সময় নবীজি একটি গর্তে পড়ে যান। কাফেররা মুসলমানদের জন্য গর্ত খুড়ে রেখেছিল নবীজিকে গর্তে পড়ে যেতে দেখে সাহাবীরা তাঁকে ঘেরাও করে রাখেন। চারদিক থেকে তীর ও তরবারির বৃষ্টি হচ্ছিল। সাহাবীরা সেসবের আঘাত নিজেদের দেহে নিচ্ছিলেন। আবু দুজানা রা. ঝুঁকে নবীজির ঢাল হয়ে যান। এদিক থেকে যত তীর এসেছে, সব তাঁর পিঠে বিদ্ধ হয়েছে। তালহা রা. তীর ও তরবারির আঘাত প্রতিহত করেন হাত দিয়ে, ফলে তাঁর হাত কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, তাঁর দেহে সত্তরটির বেশি আঘাত লেগেছে। আবু তালহা রা. একটি ঢাল দিয়ে নবীজিকে রক্ষা করছিলেন। নবীজি ঘাড় উঁচু করে ময়দানে তাকালে আবু তালহা বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আপনি মাথা ওঠাবেন না। হতে পারে শত্রুর কোনো তীর আপনার দেহে বিদ্ধ হবে। আঘাত সহ্য করার জন্য আপনার আগে আমার বুক বিদ্যমান। এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি নিহত হলে আমার ঠিকানা কোথায় হবে?' তিনি বললেন, 'জান্নাত।' ওই সাহাবীর হাতে কিছু খেজুর ছিল। এ কথা শুনে তিনি খেজুর নিক্ষেপ করে সোজা রণাঙ্গনে চলে গেলেন এবং লড়াই করে শাহাদাত বরণ করলেন।

কুরাইশের হতভাগা লোকেরা নির্দয়ভাবে নবীজির ওপর তীর নিক্ষেপ করছিল। অথচ রহমতুল লীল আলামিনের মুখে ছিল এই দোয়া :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

'হে আল্লাহ, আমার জাতিকে ক্ষমা করে দিন। কেননা, তারা জানে না।' নবীজির পবিত্র চেহারা থেকে রক্ত ঝরছিল। তিনি কাপড় দিয়ে রক্ত মুছতে থাকেন। তিনি বলেন, 'এই রক্তের একটি ফোঁটাও মাটিতে পড়লে সবার ওপর আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হতো!'
এ যুদ্ধে কাফেরদের ২২ বা ২৩ জন নিহত হয় আর মুসলমানদের ৭০ জন শহিদ হয়।

শহীদদের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা:
রাসূল (সা.) শহীদগণকে তাঁদের শাহাদাতের স্থানে কবর দিতে আদেশ দিলেন। তিনি দু'তিনজনকে একটি কবরে রাখতেন। দু'জনকে একই কাপড়ে কাফন দিতেন।
হানযালা (রাযি.) এর দেহ অদৃশ্য ছিল। তারপর দেখা গেলো এক জায়গায় তাঁর দেহ জমীন থেকে উপরে রয়েছে; তাঁর শরীর থেকে তখন টপটপ করে পানি পড়ছিলো। এ দেখে রাসূল (সা.) বললেন, ফেরেশতাগণ তাঁকে গোসল করিয়ে দিচ্ছেন। তোমরা তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করো, ব্যাপারটি কী ছিলো? জিজ্ঞেস করার পর তাঁর স্ত্রী প্রকৃত ঘটনাটি জানালেন। আর এখান থেকেই হানযালা (রাযি.) এর নাম গাসীলুল মালাইকা হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে শহীদগণের দৃশ্য ছিলো অত্যন্ত হৃদয় বিদারক। হামযা (রাযি.) এর জন্য কালো একটি চাদরের টুকরা ব্যতীত আর কাফনের কাপড় পাওয়া যায়নি। তা দিয়ে মাথা আবৃত করলে পা খোলা থেকে যেতো আর পা আবৃত করলে মাথা খোলা থেকে যেতো। অবশেষে মাথা থেকে পায়ের উপর ইযখার ঘাস চাপিয়ে দেওয়া হয়। মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি.-এর লাশ ঢেকে পা খোলা থাকতো আর পা ঢাকলে মাথা খোলা থাকতো। এ অবস্থায় রাসুল ﷺ আগের মতো ইযখার ঘাস দিয়ে তাঁর পা ঢেকে দিতে বললেন।

গাজওয়ায়ে হামরাউল আসাদ :-
মুসলিম বাহিনী মদিনায় ফিরে আসার পর রাসুল ﷺ জানতে পারলেন, আবু সুফিয়ান এবং কাফির বাহিনী ফিরে যাওয়ার পথে রওহা নামক স্থানে পৌঁছানোর পর সে তার বাহিনীকে বলছিল তোমরা কিছুই করতে পারলে না। তোমরা মুহাম্মদকে হত্যা করতে পারলে না। তাদের যুবতী নারীদের দাসী বানাতে পারলে না। এসব কথা নবীজীর কানে পৌঁছালে তিনি ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের নিয়ে হামরাউল আসাদ অভিযানে বের হন। এখানে পৌঁছে তিনি কাফের বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন। কাফিররা মুসলমানদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস করে না।

রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে রাতের বেলা অধিক পরিমাণে আগুন জ্বালানোর আদেশ দিয়েছিলেন। প্রতি রাতে একসাথে প্রায় ৫০০ আগুন জ্বলতো। নিজেদের পলায়নপরতা গোপন রাখার উদ্দেশ্যে এবং মুসলিমদের ভয় দেখানোর জন্য আবু সুফিয়ান একটি নতুন বুদ্ধি করল। কবীলায়ে আব্দুল কায়েসের একটি মদিনাগামী কাফেলার সাথে দেখা হলে আবু সুফিয়ান তাদেরকে বলল, 'তোমরা মুহাম্মদকে গিয়ে বলবে আমরা তার ও তার দলের উপর হামলা চালিয়ে তার অবশিষ্ট অংশকে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি'। আর এই কথা পৌঁছে দিতে পারলে উকায় বাজারে গিয়ে তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে কিশমিশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করল। এই কাফেলা মুসলিম বাহিনীর পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় আবু সুফিয়ানের বার্তা পৌঁছে দিল। তখন আল্লাহ সুবহানু তায়ালা আয়াত নাযিল করলেন,

“যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী। অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হল। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট।”

(সূরা আলে ইমরান, ৩:১৭৩-১৭৪)

নবীজী তার সেনাবাহিনী নিয়ে সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন কিন্তু যখন কাফেরদের আসার আর কোন সম্ভাবনা রইল না তখন তিনি নিরাপদে মদিনার পথে ফিরে গেলেন।

আর রাজীর মর্মান্তিক ঘটনা :

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে আজাল এবং কারাহ গোত্রের কয়েকজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ **এর** কাছে এসে জানালেন যে, তাদের মাঝে ইসলামের কিছু কিছু চর্চা রয়েছে। তারা পরিপূর্ণভাবে দ্বীন শিক্ষার জন্য কয়েকজন সাহাবীকে চাইলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ৬ জন মতান্তরে ১০ জন সাহাবীকে তাদের সাথে প্রেরণ করেন। রাবেগ এবং জেদ্দার মধ্যবর্তী স্থানে যখন তারা পৌঁছায় তখন তাদের উপর বনু হুজাইলের একটি শাখা গোত্র বনু লাহিয়ান সাহাবীদের উপর আক্রমণ করে। আজল এবং কারা গোত্রের লেলিয়ে দেয়ার ফলে প্রায় ১০০ জন তীরন্দাজ তাদের আক্রমণ করে। সাহাবীরা পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেন। তারা তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং প্রতিশ্রুতি দেয় তারা

নেমে আসলে তাদেরকে রক্ষা করা হবে। আসিম রা: তাদের প্রস্তাবে রাজি হয় না তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। একের পর এক তীর বর্ষণের কারণে ৭ জন সাহাবী সেখানেই শহীদ হলেন। বনু লাহিয়ান আরো একবার প্রতিশ্রুতি দেয় ফলে বাকি তিন জন নেমে আসে। সাহাবীরা নেমে আসার সাথে সাথে তাদেরকে বেঁধে ফেলা হয়। এদের মধ্যে তৃতীয় সাহাবী তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলে তাকে হত্যা করা হয়। জায়েদ বিন দাসিন্নাহ রা: এবং খুবাইব রা: কে নিয়ে মক্কায় বিক্রি করে দেয়। খুবাইবকে হত্যা করার জন্য মক্কাবাসী তাকে হারাম শরীফের বাইরে তানঈম নামক স্থানে নিয়ে যায়। তাকে শুলে চড়ানোর পূর্ব মুহূর্তে তিনি দুই রাকাত সালাত পড়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। তাকে অনুমতি দেয়া হলো। সালাম ফিরানোর পর তিনি বলেন যদি তোমাদের এই বলার ভয় না থাকতো যে, আমি যা কিছু করছি তা ভয় পাওয়ার কারণে করছি তাহলে আরো দীর্ঘ সময় আমি সালাত আদায় করতাম। তিনি আরো বলেন হে আল্লাহ তাদেরকে এক এক করে গুনে নাও। অতঃপর তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে মৃত্যু দাও এবং কাউকে অবশিষ্ট রেখো না। বন্দি অবস্থায় তাকে আঙ্গুর ফল খেতে দেখা গিয়েছিল। অথচ সেই সময় মক্কায় খেজুরও পাওয়া যাচ্ছিল না।

বীরে মাউনার ঘটনা:

রাজীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড যে মাসে ঘটে আরেকটি ঘটনা ঘটে। আবু বারা আমের বিন মালিক নামে এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে দেখা করতে আসলেন। রাসুল ﷺ তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণও করলেন না আবার পরিত্যাগও করলেন না। তিনি নবিজিকে অনুরোধ করলেন নজদ বাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য কিছু সাহাবীকে প্রেরণ করতে। তিনি নবিজিকে কথা দেন সাহাবীদের আশ্রয় দিবেন। এরপর রাসুল ৪০ জন মতান্তরে ৭০ জন আবু বারার সাথে পাঠালেন। এ দলের নেতা নিযুক্ত করা হয় মুনযির বিন আমির রা: কে। সাহাবীরা দিনের বেলা জঙ্গল থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করত এবং রাতের বেলা কুরআন পড়তেন, শিক্ষা দিতেন, আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত থাকতেন। এভাবে বীরে মাউনাতে তারা অবস্থান এবং সেখানে তাবু খাটান। হারাম মিলহান রা: সাহাবীগণ রাসুলুল্লাহর একটি চিঠি আমির বিন তুফাইলের কাছে পাঠান। তিনি সেই চিঠি ছুয়েও দেখলেন না বরং হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেন। এরপর আমির অবশিষ্ট সাহাবাদেরকে হত্যা করার জন্য তার গোত্রকে আহ্বান জানালো। কিন্তু তারা রাজি না হলে বনু সুলাইম

গোত্রকে সে আহ্বান জানালো। বনু সুলাইমের উসাইয়্যা, রি'ল এবং যাকওয়ান তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাহাবীদেরকে সেখানেই শহীদ করে ফেলল। কেবলমাত্র জীবিত ছিলেন কা'ব ইবনে যায়দ ইবনে নাজ্জার রাঃ। তাকে শহীদানের মধ্যে থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়। খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

এরপর আমির অবশিষ্ট সাহাবাদেরকে হত্যা করার জন্য তার গোত্রকে আহ্বান জানালো। কিন্তু তারা রাজি না হলে বনু সুলাইম গোত্রকে সে আহ্বান জানালো। বনু সুলাইমের উসাইয়্যা, রি'ল এবং যাকওয়ান তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাহাবীদেরকে সেখানেই শহীদ করে ফেলল। কেবলমাত্র জীবিত ছিলেন কা'ব ইবনে যায়দ ইবনে নাজ্জার রাঃ। তাকে শহীদানের মধ্যে থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়। খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

ঘটনাস্থলের আশেপাশে আরো দুজন সাহাবি আমর বিন উমাইয়্যা যমরী রাঃ এবং মুনযির ইবনে উকবা ইবনে আমের রাঃ উট চরাচ্ছিলেন। তারা ঘটনাস্থলে পাখি ওড়াউড়ি করতে দেখে সেখানে গিয়ে পৌঁছান এবং অন্যদের সাথে যুদ্ধ করতে শুরু করেন। মুনযির রাঃ শহীদ হয়ে যান আর আমর ইবনে উমাইয়্যা রাঃ বন্দী হন।

জায়নাব বিনতে খুজায়মা ও উম্মু সালামার সাথে বিবাহ :

হিজরতের প্রায় ৩১ মাস পর তৃতীয় হিজরির রমজান মাসে রাসূল সা: জায়নাব রা: এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তার স্বামী আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন।

আবু সালামা বনু আসাদ এর বিপক্ষে অভিযান এ যান। এই অভিযান সংঘটিত হয়েছিল চতুর্থ হিজরির মহরম মাসে। অভিযান থেকে ফিরে আসার পর আবু সালামা ইন্তেকাল করেন। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর নবীজি উম্মু সালামাকে বিয়ে করেন।

বদর দ্বিতীয় যুদ্ধ

বদর হয়েছিল হিজরী ২য় বর্ষে, আর উহুদের যুদ্ধ ৩য় বর্ষে। এর রেশ ধরে হিজরী চতুর্থ বছরে কাফিরদের নেতা আবু সুফিয়ান মুসলিমদের তৃতীয়বারের মতো চ্যালেঞ্জ

করে। সে দুই হাজার সৈন্যের শক্তিশালী একটি দল নিয়ে মক্কা ত্যাগ করে। কিন্তু কিছু পথ যাওয়ার পর সে মন পরিবর্তন করে। সবার উদ্দেশে বলে, ‘আমার মতে, স্বচ্ছলতার বছর ছাড়া যুদ্ধে অংশ নেওয়া সমীচীন হবে না। বরং যে বছর তৃপ্তির সাথে পশুদের ভালো ঘাসপাতা খাওয়াতে পারবে এবং নিজেরা ইচ্ছেমতো দুধ পান করতে পারবে, সে বছরই যুদ্ধ করা ভালো হবে। এবার শুষ্ক মৌসুম। আমি ফিরে যাচ্ছি, তোমরাও ফিরে চলো।' হতে পারে এ কথাগুলো আবু সুফিয়ানের অজুহাত মাত্র। মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে কুরাইশরা এর আগেও খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। হয়তো ঝোঁকের বশে সে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে কিন্তু পরে বুঝতে পারছে খুব একটা সুবিধা করা যাবে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দৃঢ়তায় কোনো ফাটল ধরেনি। নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত জায়গায় দেড় হাজার মুজাহিদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ শিবির স্থাপন করলেন। সেখানে আট দিন অবস্থান করলেন। ওদিকে কুরাইশদের দেখা নেই। সেখানে অবস্থানকালে তাঁর সাথে দেখা হলো বনু দামরা গোত্রের মুখশীর সাথে। ইতিপূর্বে এই গোত্রের সাথে মুসলিমদের শান্তিচুক্তি ছিল। মুখশী রাসূলুল্লাহ সা:কে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনারা কি কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যই এখানে এসেছেন?' রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা সেজন্যই এসেছি। আর তোমরা যদি চাও তাহলে আমাদের সাথে যে চুক্তি ছিল তা প্রত্যাহার করতে পারো। সেক্ষেত্রে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা করেন।' মুখশী জবাব দিল, সে বললো, 'নাহ, এমন কিছু করার কোনো প্রয়োজন দেখি না।'
রাসূলুল্লাহ সা: এর এই কথাগুলো বলে মুখশীকে সূক্ষ্ম একটি ইঙ্গিত দিচ্ছেন; আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখি, সেই শক্তি আমাদের ভালোই আছে। চুক্তির সময়সীমা বাড়ানোর ব্যাপারে তোমাদের প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের নেই।

খন্দক যুদ্ধ বা গাযওয়ায়ে আহযাব

রাসূল ﷺ যখন মদিনায় হিজরত করে তখন সন্ধি করে নেন। মুসলমান মুসলমানরা সর্বদা চুক্তি রক্ষা করার ব্যাপারে সচেতন ছিল। নবীজির মদিনা আগমনের আগে ইহুদিরা মদিনাতে ক্ষমতাশীল ছিল। মদিনাতে নবীজির এবং ইসলামের শান শওকত

বৃদ্ধি পেতে দেখে তারা ভিতরে ভিতরে ভীষণ রকমের প্রতিহিংসা তৈরি করতে থাকে। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের জয়ের পরে তাদের ক্রোধ বাড়তে থাকে। তারা প্রকাশ্যে চুক্তি ভঙ্গ করতে থাকে। বনু কাইনোকা যুদ্ধের পর বনু নাজির বিদ্রোহ করে। সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে নবীজি যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। তাদেরকে কেল্লাতে আবদ্ধ রেখে পরবর্তীতে দেশান্তর করা হয়। এদিকে মক্কার কুরাইশরা ইহুদিদের এবং মুনাফিকদের উস্কানি দিতে থাকে। তাদের মধ্যে মিত্রতা গড়ে ওঠে।

অবশেষে পঞ্চম হিজরীর জিলকদ মাসে তারা নিজেদের পূর্ণ শক্তি একত্রিত করে মদিনায় আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। নবীজির কাছে সংবাদ পৌঁছালে তিনি সাহাবীদের নিয়ে মাসোয়ারা করেন। সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শ দেন ময়দানে বের হয়ে যুদ্ধ না করে যেদিক থেকে তারা মদিনায় প্রবেশ করতে পারে, সেই জায়গাগুলোতে পরিখা বা খন্দক খনন করা হোক।

প্রায় তিন হাজার সাহাবী কে নিয়ে নবীজি পরিখা খনন আরম্ভ করেন। ছয় দিনে পাঁচ গজ গভীর পরিখা খনন করা হয়। পরিখা খননের সময় বিরাট একটি পাথর বের হয়। কেউ এটি ভাঙতে সক্ষম হয় না। নবীজি এসে নিজ হাতে পাথরের উপর একটি আঘাত করেন আর সেটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এভাবেই পরিখা খননের কাজ সমাপ্ত হয়।

কিছুদিন পর কাফেরদের মদিনা অবরোধ করে এবং প্রায় ১৫ দিন মুসলমানরা অবরুদ্ধ থাকেন। এই সময় বনু কুরাইযাও চুক্তি ভঙ্গ করে শত্রুদের সাথে মিত্রতা করে। অবরোধের কারণে মদিনা শহরের দুশ্চিন্তা ছড়িয়ে পড়ে। খাবারের স্বল্পতা দেখা দেয়। এমনকি আল্লাহর নবী উদার যন্ত্রণার সহিতে না পেরে পেটে পাথর বেঁধে রাখে। কিন্তু শত্রু বাহিনী পরিখা পাড়ি দিতে না পেরে অনবরত তীর ও পাথর বর্ষণ করতে থাকে।

বনু কুরাইযা অভিযান:

খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পর রাসূল ﷺ যোহরের সময় গোসল করছিলেন। এমন সময় জিবরাঈল আ. আগমন করলেন। বললেন, আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন? ফেরেশতাগণ কিন্তু এখনও অস্ত্র খোলেননি। আমিও শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে সরাসরি এখানে এসেছি। চলুন, বনু কুরাইযাহর অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকুন। আমি আগে গিয়ে তাদের দুর্গসমূহে কম্পন সৃষ্টি করি।

রাসূল ﷺ একজন সাহাবীর মাধ্যমে ঘোষণা করে দিলেন বনু কুরাইযাহ যাওয়ার কথা। আলী রাযি. এর হাতে পতাকা দিয়ে রাসূল ﷺ তাঁকে প্রেরণ করলেন। যখন তিনি বনু কুরাইযাহর নিকটবর্তী হলেন, তাদের রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে কটু কথা বলতে শুনলেন। এদিকে মুসলিম বাহিনী বনু কুরাইযাহর ভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন। তারা দুর্গসমূহের চারপাশে ঘেরাও দিয়ে দিলেন।বনু কুরাইযার সামনে তখন একটি পথ খোলা ছিল; তা হলো আত্মসমর্পণ করা। তারা মুসলিমদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে চাইলো। এই প্রেক্ষিতে তারা রাসূল ﷺ এর কাছে আবেদন করলো, আবু লুবাবা রাযি. কে প্রেরণ করার জন্য। আবু লুবাবা তাদের কাছে গেলে বনু কুরাইযার পুরুষরা তাঁর কাছে দৌড়ে এলো। মহিলারা ও শিশুরা করুণভাবে কাঁদছিলো। এ দেখে তাঁর মাঝে আবেগের উদ্রেক ঘটে। তারা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ সম্পর্কে জানতে চায়। তারা কি তা করবে, নাকি করবে না? আবু লুবাবা রাযি. হ্যাঁ বললেন। সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে কণ্ঠনালীর দিকে ইঙ্গিত করলেন, যার অর্থ ছিল হত্যা। তখনই আবু লুবাবা উপলব্ধি করলেন যে, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত হয়েছে। তাই তিনি রাসূল ﷺ এর কাছে না গিয়ে সরাসরি মসজিদে নববীতে চলে যান। নিজেকে খুঁটির সাথে বেঁধে ফেললেন। শপথ করলেন যে, রাসূল ﷺ না খোলা পর্যন্ত তিনি এ অবস্থাতেই থাকবেন। আর তিনি বনু কুরাইযার ভূমিতে কভু পা ফেলবেন না। রাসূল ﷺ তা শুনে বললেন, যদি সে আমার কাছে আসতো; তবে আমি তাঁকে ক্ষমা করে দিতাম। কিন্তু সে এ কাজ করায় আল্লাহ তার তওবা কবুল করা পর্যন্ত আমি তাঁর বাঁধন খুলতে পারবো না।

এদিকে আবু লুবাবার ইশারা সত্ত্বেও তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে, তারা আত্মসমর্পণ করবে। অথচ তাদের কাছে দীর্ঘকাল দুর্গে অবস্থান করার মতো রসদ ছিলো। তাদের সহ্য করার মতো সামর্থ্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তাদের উদ্যম ঐ সময় শেষ হলো, যখন আলী রাযি. ও যুবায়ের রাযি. তাদের দুর্গ তোরণের দিকে এগিয়ে গেলেন। আলী রাযি. শপথ করে বললেন, আমি হয় সে অমৃত সুধা পান করবো; যা হামযা পান করেছেন আর নয়তো আমি এ দুর্গ জয় করবো। আলী রাযি. এর সংকল্পের কথা শুনে তারা আত্মসমর্পণ করলো। তাদের পুরুষদেরকে আলাদা করে বন্দী করে রাখা হলো। মহিলা ও শিশুদেরকে আলাদা করে রাখা হলো। আওস গোত্রের নেতৃস্থানীয়রা তাদের প্রতি সদয় আচরণ করতে অনুরোধ করলেন, যে রকম বনু কাইনুকা'র সাথে করা হয়েছিল। রাসূল ﷺ বললেন, আপনাদের জন্য কি

এতটুকু যথেষ্ট নয় যে, আপনাদেরই একজন তাদের বিচার করবে? তারা বললো, জি হ্যাঁ।
রাসূল ﷺ সা'দ ইবনে মুআয রাযি. কে বিচারের দায়িত্বভার দিলেন। তিনি আহত ছিলেন তাই মদীনায় রয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে ডেকে পাঠালেন রাসূল ﷺ। তারপর সা'দ রাযি. এসে রাসূলের আদেশক্রমে তাদের বিচার করলেন, তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হোক আর মহিলা ও শিশুদের বন্দী করে রাখা হোক। সম্পদসমূহ বণ্টন করে দেওয়া হোক। রাসূল ﷺ বললেন, আপনি ঠিক তেমনই বিচার করলেন। আল্লাহ তাআলা'র যেমন ফায়সালা ছিল।
তারপর তাদের সকল বালেগ পুরুষদেরকে হত্যা করা হয়। আর এক মহিলাকে খাল্লাদ ইবনে সুয়াইদ রাযি. কে আক্রমণ করে শহীদ করার অপরাধে হত্যা করা হয়।
এদিকে আবু লুবাবা রাযি. ছয় রাতের মতো বাঁধা অবস্থায় সময় অতিবাহিত করেন। প্রত্যেকবার সালাতের সময় তাঁর স্ত্রী এসে বাঁধন খুলে দিতেন। আবার নামাজ শেষে তিনি নিজেকে বেঁধে নিতেন। তারপর ভোরের সময় তাঁর তাওবা কবুল করা হয়। সে সময় রাসূল ﷺ উম্মে সালামাহর রাযি. ঘরে ছিলেন। তিনি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁকে সুসংবাদ শুনালেন। এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর বাঁধন খুলতে এগিয়ে আসেন; কিন্তু তিনি রাসূল ﷺ ছাড়া অপর কারো হাতে বাঁধন খুলতে অস্বীকার করেন। পরে ফজরের জন্য বের হলে রাসূল ﷺ তাঁর বাঁধন খুলে দেন।এ যুদ্ধ যুল কা'দাহ মাসে সংঘটিত হয়।

বনু আল-মুস্তালিকের যুদ্ধ :
এই সময় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ছিল খুযআ গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত বনু মুস্তালাকের যুদ্ধ। তাদের সাথে কুরাইশদের মিত্রতা ছিল। মদিনা আক্রমণের নিশ্চিত খবর পেয়ে রাসূল সা: প্রায় ৭০০ মুজাহিদ নিয়ে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। যে জায়গাটিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেটার নাম আল মুরাইসী। তারা কোন প্রতিরোধই করতে পারে না। তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, স্ত্রী ও সন্তানদের বন্দি করে নিয়ে আসা হয়। সাধারণত মুসলমানরা যখন শত্রুর উপর আক্রমণ করে তখন ইসলাম গ্রহণের জন্য তিন দিন সময় দেয়া হয়ে থাকে। তাদেরকে বলা হয়, মুসলিম হও নাহলে জিযিয়া দাও। আর যদি কোন প্রস্তাবে রাজি না হও তাহলে যুদ্ধ কর। কিন্তু বনু

মুস্তালিককে সময় দেয়া হয় না কারণ তাদেরকে আগেই ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল এবং তারা স্বেচ্ছায় কুরাইশদের মিত্র হিসেবে বেছে নেয়।

ফাদাক অঞ্চলে অভিযান:
৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে ২০০ জন মুজাহিদের একটি বাহিনী আলী রাযি. এর নেতৃত্বে বনু সা'দের আবাস স্থলে প্রেরিত হয়। বনু সা'দের একটি দল ইয়াহুদীদের সাহায্য করার ব্যাপারে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছিল। তাঁরা রাতে হামলা করতেন আর দিনে আত্মগোপনে থাকতেন। এক সময় শত্রুদের গোয়েন্দা ধরা পড়লে তার কাছ থেকে তাদের অবস্থান জানা যায়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাদের উপর হামলা করা হয়। এ অভিযানে গনীমত হিসেবে পাঁচশ' উট ও দু'হাজার ছাগল পাওয়া গেলো; তবে তারা শিশু ও মহিলাসহ সকলে পলায়ন করলো।

হুদাইবিয়া'র সন্ধি

উমরাহ করার সংকল্প:
রাসূল ﷺ-কে স্বপ্নযোগে দেখানো হলো, তিনি ও তাঁর সাহাবাগণ কা'বা ঘরের চাবি গ্রহণ করে উমরাহ পালন করেছেন। রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে এ স্বপ্নের কথা বললে তাঁরা আনন্দিত হন। তাঁরা ধারণা করলেন, অচিরেই মক্কায় প্রবেশাধিকার লাভ হবে। রাসূল ﷺ উমরাহ করার নিয়ত করলেন আর সাহাবায়ে কেরামদের এ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হতে বললেন। আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চলেও এ ঘোষণা করা হলো। তিনি ষষ্ঠ হিজরীর পহেলা যুলকা'দাহ মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর সঙ্গে এ সফরে ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামাহ রাযি.। সে সাথে ১৪০০ জন মতান্তরে ১৫০০ জন সাহাবা রাযি.। সফররত অবস্থায় অস্ত্র গ্রহণের নিয়মে কোষবদ্ধ তলোয়ার নেওয়া ছাড়া তাঁরা পৃথক কোনো অস্ত্র সঙ্গে নেননি।
যুল হুলাফায় গিয়ে কুরবানীর পশুকে হার পরিয়ে উটের পিঠের কুজ কেটে দিয়ে কালাদাহ করা হলো। তারপর উমরার জন্য সকলে ইহরাম বাঁধলেন। এর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল; যেন লোকজন নিশ্চিত থাকে যে, উমরাহ করাই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এদিকে রাসূল ﷺ কুরাইশদের খবরাখবর নেওয়ার জন্য খুযাআ গোত্রের এক গোয়েন্দাকে প্রেরণ করলেন। যখন তাঁরা উসফান নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন সে গোয়েন্দা এসে জানালেন- কা'ব ইবনে লুওয়াই তার সাহায্যকারী মিত্রদের সঙ্গে একত্র হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ও আল্লাহর ঘর থেকে তাঁদেরকে বাধা প্রদানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারপর রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরাম এর সাথে পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নিলেন সামনে এগিয়ে যাবেন।

সন্ধি ও বাইয়াতে রিদওয়ান:

সাহাবীদের যাত্রাবিরতির স্থানে একটি শুকনো কুয়া ছিল। নবীজির বরকতে সেটিতে এত পানি আসে যে, সবাই তৃপ্তি সহকারে পান করেন। এখানে পৌঁছে নবীজি উসমান (রা.)-কে মক্কা প্রেরণ করেন কুরাইশদের এ কথা জানানোর জন্য যে, নবীজি এখন শুধু বাইতুল্লাহর যিয়ারত ও উমরা করতে এসেছেন, কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়। উসমান (রা.) মক্কায় যাওয়ার পর কাফেররা তাঁকে আটকে রাখে। এদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, কাফেররা তাঁকে হত্যা করেছে। নবীজির কাছে এই সংবাদ পৌঁছালে তিনি একটি বাবলা গাছের নিচে বসে সাহাবীদের কাছ থেকে জিহাদের বাইয়াত (শপথ) নেন। এর আলোচনা কুরআনে করা হয়েছে। এর নাম বাইয়াতে রিদওয়ান। পরে জানা যায়, ওই সংবাদ ভুল ছিল। কুরাইশরা সুহাইল বিন আমরকে সন্ধির আলোচনা করতে পাঠায়। কিছু শর্ত নির্ধারণ করে চুক্তিনামা লেখা হয় এবং ১০ বছরের জন্য সন্ধি হয়ে যায়।

সন্ধির শর্তাবলি:

১. ১০ বছর দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

২. মুসলমানরা এখন উমরা না করেই ফিরে যাবে।

৩. পরের বছর উমরা করতে এসে ৩ দিন অবস্থান করে চলে যাবে।

৪. খাপবদ্ধ তরবারি ছাড়া কোনো অস্ত্র আনা যাবে না।

৫. মক্কার কেউ মুসলমান হয়ে মদিনায় গেলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু কোনো মুসলমান মক্কায় পালিয়ে এলে কুরাইশরা তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য নয়।

এ সকল শর্ত মুসলমানদের বিপক্ষে ছিল। বাহ্যিকভাবে এটি ছিল পরাজয়মূলক সন্ধি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এর নাম দেন 'বিজয়'। এই সফরেই সূরা ফাতহ নাযিল হয়। ('ফাতহ' অর্থ বিজয়)। এভাবে দমে গিয়ে সন্ধি করাটাকে সাহাবীরা কিছুতেই মেনে

নিতে পারছিলেন না। উমর (রা.) বারবার নবীজিকে এ কথা বলেন। কিন্তু তিনি বলেন, "এটি আল্লাহর আদেশ। আর এটি আমাদের ভবিষ্যতের জন্য কল্যাণকর।"

পরবর্তী সময়ের ঘটনাপ্রবাহ দেখলে এ কথার বাস্তবতা বুঝা আসে। এই সন্ধির ফলে মক্কা-মদিনার মধ্যে নিরাপদ যাতায়াত আরম্ভ হয়। কাফেররা মদিনায় মুসলমানদের কাছে যেতে থাকে। ইসলামি শিষ্টাচারের চৌম্বকীয় আকর্ষণ তাদেরকে টানতে থাকে। ঐতিহাসিকদের বক্তব্য হলো, এ সময়ে এত বেশি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে, যা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। মূলত এই সন্ধি ছিল মক্কা বিজয়ের প্রাথমিক ধাপ।

খালিদ বিন ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণ:

তখন পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ। উহুদ যুদ্ধে তাঁর কৌশলী আক্রমণে কাফেররা যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়েছিল। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর নিজে থেকেই মুসলমান হওয়ার জন্য মদীনার পথে রওনা হন। মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করেন।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে ইসলামের দাওয়াত :

সন্ধির ফলে যাতায়াতের পথ নিরাপদ হয়ে যায়। তখন নবীজি হকের বাণী পৃথিবীর সকল বাদশাহর কাছে পৌঁছে দিতে চাইলেন।

আমর বিন উমাইয়া রা.-কে হাবাশার সম্রাট আসহামা নাজাশীর কাছে পাঠানো হয়। তিনি নবীজির পত্রকে দুই চোখের ওপর রাখেন এবং সিংহাসন থেকে নেমে মাটিতে বসে পড়েন। এরপর খুশিমনে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজির জীবদ্দশায় তার মৃত্যু হয়।

সাহাবী দিহয়া কালবী রা.-কে রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে পাঠানো হয়। অকাট্য দলিল ও পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবের সাক্ষ্য দ্বারা তার কাছে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, নবীজি সত্য রাসূল। তাই তিনি ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করেন। তবে তার ইচ্ছার কথা শুনে দরবারের নেতৃবৃন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তার প্রবল ধারণা হয়, ইসলাম গ্রহণ করলে প্রজারা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। এজন্য তিনি বিরত থাকেন।

আবদুল্লাহ বিন হুযাফা রা.-কে ইরানসম্রাট খসরু পারভেজের কাছে পাঠানো হয়। এই হতভাগা নবীজির পত্রের সাথে বেয়াদবি করে। পত্রটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। নবীজি এই সংবাদ পেয়ে বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তার সাম্রাজ্যকে এভাবে খণ্ডবিখণ্ড করুন, যেভাবে সে আমার পত্রকে করেছে।' নবীদের সর্দারের দোয়া কীভাবে বিফলে

যাবে! কিছুদিনের মধ্যেই খসরু পারভেজ আপন পুত্র শেরওয়াইহের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়।

হাতিব বিন আবু বালতাআকে মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক মুকাওকিসের কাছে প্রেরণ করা হয়। তার অন্তরেও আল্লাহ তাআলা ইসলামের সত্যতার বিষয়টি ঢেলে দেন। তিনি নবীজির দূতের সাথে অনেক ভালো ব্যবহার করেন। নবীজির জন্য কিছু উপঢৌকন পাঠান। যার মধ্যে মারিয়া কিবতিয়া নামক একজন বাঁদি ছিলেন এবং 'দুলদুল' নামক একটি সাদা খচ্চর ছিল। এক বর্ণনায় আছে, উপহারের মধ্যে এক হাজার দিনার এবং ২০ জোড়া পোশাকও ছিল। আমর বিন আস রা.-কে পাঠানো হয় ওমানের শাসকদ্বয় জাইফার ও আবদুল্লাহ (ইয়ায়)-এর কাছে। ব্যক্তিগত গবেষণা ও পূর্ববর্তী কিতাবের মাধ্যমে এ দুজনেরও নবীজির সত্যতার ব্যাপারে বিশ্বাস হয়ে যায় এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। তখনই প্রজাদের থেকে যাকাত আদায় শুরু করেন এবং আমর বিন আসের হাতে তুলে দেন।

ঐতিহাসিক খায়বার যুদ্ধ

মদিনাতে বসবাসকারী বনু নাজির গোত্র আশ্রয় নিয়েছিল খায়বার। তখন থেকেই ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে বিদ্বেষ দেখাতে শুরু করেন। বনু নাজিরের বিভিন্ন নেতা যেমন সালাম ইবনে আবি আল হুকাইক, কিনানা ইবনে আবি আল হুকাইক, হুয়াই ইবনে আখতাব প্রমুখ তারাই খাইবারের ইহুদিদেরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য উসকে দেয়।

মুসলমান দের খায়বারের পথে যাত্রা:

খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী সপ্তম বর্ষের মুহররম মাসে। হুদায়বিয়া থেকে ফেরার পর মহররম মাসের শেষভাগে তারা খাইবারের দিকে যাত্রা করে। নবীজির সাথে ছিল বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ নেয়া ১৪০০ জন সাহাবী। খায়বার ছিল এক বিশাল এলাকা জুড়ে অনেকগুলো দুর্গের সমারোহ। অনেকগুলো দুর্গ থাকার কারণে ইহুদিদের সাথে আগের যুদ্ধগুলোর তুলনায় এই যুদ্ধ জটিল ছিল। নবীজি একে একে

সকল দুর্গ জয় করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। শুরু হলো নাঈম দুর্গ দিয়ে। যুদ্ধ শুরু হলো ইহুদিদের এক সাহসী যোদ্ধা বের হয়ে আসলো যার নাম মারহাব। তার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হল আমির ইবনে আল আকওয়া রা:। কিছুক্ষণ পর তিনি শহীদ হয়ে গেলে তার জায়গায় আসে আলী রা:। তিনি এসেই মারহাবকে হত্যা করেন। মতান্তরে মারহাবকে হত্যা করে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ রা: ।দশ দিনের মাথায় আলী রা: এ নেতৃত্বে নাঈম দুর্গ জয় হয়। এভাবেই একের পর এক দুর্গ জয় করতে থাকেন।এই যুদ্ধে আলী রা: অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি একাই খায়বারের দুর্গের ফটক উপড়ে ফেলেন।সমগ্র খায়বার বিজয়ের পর ইহুদিরা সন্ধি আলোচনার জন্য নেমে আসে।

সাফিয়া (রাঃ) এর সাথে বিয়ে:

উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া (রাঃ)-এর স্বামী ছিলেন কিনানা বিন আবুল হুকাইক, যাকে অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে হত্যা করা হয়েছিল এবং তাঁর স্ত্রীকে বন্দী করা হয়। রাসূল (সাঃ) সাফিয়া (রাঃ)-কে ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে মুক্ত করে রাসূল (সাঃ) বিয়ে করেন।

বিষাক্ত খাবারের ঘটনা:

রাসূল ﷺ যখন খায়বারের বিজয়ের পর আরামবোধ করলেন। তখন সাল্লাম ইবনে মিশকালের স্ত্রী যায়নাব বিনতে হারিস বকরির গোশত দুনা করে পাঠালো। সে জেনে নিয়েছিলো যে, রাসূল ﷺ রানের গোশত পছন্দ করেন। তাই সে গোশতের সাথে বিষ মেশালো। তারপর তা রাসূল ﷺ এর কাছে নিয়ে আসে। রাসূল ﷺ রানের কিছু অংশ উঠিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করলে কিছু অংশ চিবানোর পর মুখ থেকে ফেলে দেন। বললেন, এ হাড় আমাকে বলছে যে, এর সাথে বিষ মেশানো হয়েছে। তারপর যায়নাবকে ডাকা হলে সে সত্যটা স্বীকার করে বলে, আমি জানতে চেয়েছিলাম, যদি বাদশাহ হোন; তবে আমরা তার থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবো। আর তিনি যদি নবীই হোন; তবে আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দেবেন। ফলে তিনি বেঁচে যাবেন। এরপর তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু পরে যখন এ গোশত খাওয়ার কারণে বিশর রাযি.মৃত্যুবরণ করের,তখন তাকে হত্যা করা হয়।

কাযা উমরাহ পালন :

এর আগের বছর কাফেরদের বাধা প্রদান করার কারণে ওমরা আদায় করতে পারেননি রাসূল ﷺ। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে ছিল মুসলমানরা পরের বছর ওমরা করতে আসতে পারবে কিন্তু তিন দিনের বেশি অবস্থান করতে পারবেন না। নবীজি সাহাবীদের নিয়ে ওমরা করতে মক্কায় যান এবং সন্ধির শর্ত মোতাবেক ফিরে আসেন।

মায়মুনা বিনতে হারিস রা : এর সাথে বিবাহ বন্ধন:-

ওমরা পালন করার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়মুনা বিনতে হারিস রা : কে বিয়ে করেন। মায়মুনা রা: এর স্বামী আবু রহম ইবনে আব্দুল উজ্জা মারা যাওয়ার পর তিনি বিধবা হয়ে গিয়েছিলেন। আর দায়িত্ব নেওয়ার মতো মক্কায় কেউ ছিলেন না। এবং এই খবর জানার পর রাসূল ﷺ মায়মুনা রা: কে বিয়ে করতে সম্মত হন।

মুতার যুদ্ধ

মুতা হচ্ছে বায়তুল মাকদিস থেকে দু'মঞ্জিল দূরে জর্ডান অঞ্চলে বালকা নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। এ যুদ্ধ খ্রিস্টান দেশসমূহ বিজয়ের পূর্বসূত্র। অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উলা মোতাবেক ৬২৯ সনের আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

যুদ্ধের কারণ:

এ যুদ্ধের কারণ ছিল রাসূল (সা.) বুসরা শহরের শাসকের নিকট পত্র দিয়ে হারিস ইবনে উমায়ের আযদী রাযি. কে প্রেরণ করেন। কিন্তু রোমান সম্রাটের বালকার গভর্নর শুরাহবিল ইবনে আমর গাসসানী তাঁকে বন্দী করে এবং শক্ত করে বেঁধে হত্যা করে। দূত হত্যা যুদ্ধ ঘোষণার চেয়েও জঘন্য। রাসূল (সা.) তাদের বিরুদ্ধে ৩০০০ সেন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। যা এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় ইসলামী সৈন্যবহর।

মুসলিম বাহিনীর পরামর্শ সভা:

মুসলিম বাহিনী মাআন নামক জায়গায় তাবু খাটায়। তারা জানতে পারে যে রোমানরা এক লাখ সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছে। শুরাহবিল বিন আমর এর নেতৃত্বে অতিরিক্ত

এক লাখ সৈন্য সমবেত হয়েছে। তারা ভাবতে লাগলো ২ লাখ সৈন্যর সাথে মাত্র তিন হাজার সৈন্য দিয়ে তারা মোকাবেলা করবেন কিভাবে। আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা: সবাইকে মনে করিয়ে দেয় তারা আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করছে। শাহাদত বরণ করার মধ্যে তারা আরো বেশি মর্যাদাবান হবে। তার কথা শুনে সবাই সাহস পায়।

যুদ্ধের ময়দান::

মুসলমান বাহিনীর সাথে শত্রুদের মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হয়। এক পাশে ছিল অস্ত্রে সজ্জিত ৩০০০ মুসলিম সৈন্য আর অন্য পাশে ছিল উন্নত যুদ্ধ সরঞ্জাম সাথে রোমান ও মিত্রবাহিনীর ২ লাখ সৈন্য। জায়েদ বিন হারিসা সর্বপ্রথম যুদ্ধের পতাকা ধারণ করেন এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। এক পর্যায়ে তিনি শহীদ হয়ে যান। তারপর সেনাপতির দায়িত্ব নেন জাফর রাযি.। তিনি যুদ্ধ শুরু করেন। একপর্যায়ে তার ডান হাতটা কাটা পড়ে। তিনি তার বাঁ হাত দিয়ে পতাকা তুলে ধরেন। এরপর তার বাঁ হাতটাও কাটা পড়ে। অবশিষ্ট উভয় হাতের অংশ দিয়ে পতাকা বুকে জড়িয়ে ধরে রাখেন। সর্বশেষ তিনি শহীদ হন। এরপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা: পতাকা উঠিয়ে নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেন। এবং তিনিও শহীদ হয়ে যান। তিনজন সেনাপতি শহীদ হয়ে যাওয়ার পর সাহাবীগণ খালিদ বিন ওয়ালিদ কে সেনাপতি নির্বাচন করেন। তিনি এই যুদ্ধে নয়টি তলোয়ার ভেঙে ছিলেন এবং ইয়েমেনের তৈরি ছোট একটি তলোয়ার তার কাছে অবশিষ্ট ছিল। এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ এর রণকৌশল এর মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে এই যুদ্ধ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তারা ধীরে ধীরে পিছিয়ে মদিনাতে ফিরে আসে। এই যুদ্ধে সরাসরি নবীজি অংশ নেননি কিন্তু এই যুদ্ধ এত বিশাল এবং এত বেশি ভয়াবহ ছিল যে একে গাজওয়া বলে অভিহিত করা হয়।

যাতুস সালাসিল অভিযান

মুতাহর যুদ্ধে রোমানদের পক্ষে শামবাসী আরবদের এক বিশাল অংশ যোগ দেয়। তাই রাসুল ﷺ তাদের মাঝে ও রোমানদের মাঝে ফাটল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তারা যেন পরবর্তীতে রোমানদের সাথে যোগ না দেয়, সে ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে আমর ইবনুল আস রাযি. এর নেতৃত্বে অষ্টম হিজরী সনের জুমাদাল উখরা ৩০০ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এছাড়াও বলা হয় যে, মুসলিম গোয়েন্দাগণ সংবাদ দিয়েছেন, বনু কুযাআহ মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে সেনা সংগ্রহ করছে। তাই বলা যায়, এ দু'টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অভিযানটি পরিচালিত হয়।
মুসলিম বাহিনী রাতের সময় সামনে অগ্রসর হতো আর দিনের সময় আত্মগোপনে থাকতো। শত্রুপক্ষের কাছাকাছি যাওয়ার পর জানা গেলো, তাদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি। তাই আমর রাযি. সাহায্য পাঠানোর অনুরোধসহ রাফি' ইবনে মাকীস জুহানী রাযি. কে রাসুল ﷺ এর কাছে প্রেরণ করেন। রাসুল ﷺ আবু উবায়দা রাযি. এর নেতৃত্বে ২০০ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁকে আমর রাযি. এর সাথে মিলেমিশে কাজ করার উপদেশ দেন। এ বাহিনীতে বড় বড় মুহাজির সাহাবী ও আনসারদের নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ ছিলেন।
সাহায্য আসার পর কুযাআহ'র অঞ্চল পদানত করা হলো। তারপর তাঁরা দূর-দূরান্তের সীমানা পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। অগ্রসর হওয়ার সময় তাঁরা একটি বাহিনীর সম্মুখীন হন; তবে শত্রুরা আক্রমণের মুখে বিক্ষিপ্ত হয়ে এদিক সেদিক পলায়ন করে।

মক্কা বিজয়

হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, কেউ যদি চায় তবে মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে। আবার কেউ চাইলেই কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে এবং এই বিষয়ে সকল গোত্রের স্বাধীনতা ছিল। এই শর্তে খুযায়া গোত্র মুসলিমদের সাথে এবং বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে মিত্রতা করে। কিন্তু জাহেলী যুগ থেকেই তাদের মাঝে চলে আসা শত্রুতা কারণে বনু বকর এক পর্যায়ে এই চুক্তি লঙ্ঘন করে ফেলে। ৮ম হিজরীর শাবান মাসে বনু বকরের নওফেল ইবনে মুয়াবিয়া দিলি নামে এক ব্যক্তি

কিছু মানুষ নিয়ে রাতের অন্ধকারে বনু খুযায়া গোত্রের উপর আক্রমণ করে বসে। খুযায়া গোত্রের লোকেরা মক্কায় পৌঁছে বুদাইল বিন ওয়ারাকা খুযায়ী এবং নিজেদের মুক্ত করা দাস রাফির ঘরে আশ্রয় নেন। আমর বিন সালিম খুযায়ী সেখান থেকে বের হয়ে মদিনার দিকে রওনা দেন। এবং রাসূলের কাছে এসে তাকে সবকিছু জানান।

কুরাইশদের আতঙ্ক:

কুরাইশ চুক্তি ভঙ্গ করে কিন্তু তাদের মধ্যে এই ভয় কাজ করে যে মুসলমানরা যদি শুনতে পায় তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ শুরু করেছে এর ফলাফল ভালো হবে না। এবং সর্বসম্মতিক্রমে তারা তাদের অঙ্গীকার নবায়ন করার জন্য আবু সুফিয়ানকে মদিনায় পাঠান। তিনি মদিনায় এসে তার কন্যা উম্মে হাবিবর ঘরে পৌঁছান। তাকে দেখে তার কন্যা বিছানা গুটিয়ে ফেলেন এবং তাকে বলেন আপনি অপবিত্র। আর এটি রাসূলের বিছানা তাই অপবিত্র কেউ এখানে বসতে পারেনা। তারপর তিনি রাসূল সা: এর নিকট যায় এবং বিভিন্ন কথা বলেন। নবীজি তার কোন কথার উত্তর দেন না। সাহাবীদের সাথে কথা বলে তিনি বুঝতে পারেন তাদের আর কোন উপায় নেই। কোনভাবেই এই অঙ্গীকার নতুন করে বলবৎ হবেনা।

মক্কা অভিযানে প্রস্তুতি:

নবীজি অঙ্গীকার ভঙ্গের তিন দিন আগেই আয়েশা রা সফর জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ান ফিরে যাওয়ার পর রসূল সা: সবাইকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেন। এরপর অত্যন্ত গোপনে অষ্টম হিজরীতে রমজান মাসে প্রথমভাগে আবু কাতাদাহের নেতৃত্বে ৮ জন মুজাহিদ নিয়ে গঠিত ছোট্ট একটি বাহিনী মদিনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে বা তুমি ইজাম নামক স্থানে প্রেরণ করেন। সাধারণ মানুষকে না বুঝতে দেয়ার জন্য এই ব্যবস্থা নেয়া হয়, পরবর্তীতে তারা রাসূলের কাছে মক্কার দিকে রওনা হয়।

এদিকে হাতিব বিন আবি বালতায়া রা: কুরাইশদের নিকট চিঠি লিখে পাঠালেন, নবীজির মক্কা আক্রমণের খবর। তিনি এক মহিলার খোপার মধ্যে করে সেই চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার প্রিয় রাসূল সা: কে এই খবর জানিয়ে দেন। এবং হযরত আলী রা:, জুবায়ের রা:, মিকদাদ রা: এবং আবু মারসাদ রা: কে সেই চিঠি উদ্ধার করতে পাঠান।

মক্কার দিকে রাসূল ﷺ ও তার সেনাগণ:

অষ্টম হিজরীর দশ রমজান রাসূল ﷺ তার বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। বাহিনীতে ছিল ১০ হাজার সাহাবী। মদিনার প্রশাসনিক দায়িত্ব আবু রুহম কুলসুম ইবনুল হুসাইন আল গিফারী রা: এর উপর দিয়ে যান। পথিমধ্যে নবীজির চাচা আব্বাস রা: ও তার পরিবারের সাথে দেখা হয়। তারা ছিল সর্বশেষ মুহাজির।

রাসূলুল্লাহ সাঃ সফর অব্যাহত রাখেন। এই সফরকালে রাসূলুল্লাহর সাহাবীগণ রোজাদার অবস্থায় ছিলেন। আসফান এবং কুদাইদ নামক জলাশয়ের নিকটে পৌঁছে রাসূল সাঃ এবং সাহাবীগণ রোজা ভঙ্গ করে ফেললেন। এরপর আবার সফর অব্যাহত রাখেন। এভাবে রাত্রির পূর্বভাগ সফর করেন এবং মাররুয যাহরান উপত্যকায় পৌঁছে শিবির স্থাপন করলেন। সেখানে তার নির্দেশক্রমে লোকেরা পৃথক পৃথক আগুন জ্বালালো। এভাবে ১০,০০০ স্থানে আগুন জ্বালানো হয়। রাসূলুল্লাহ সাঃ হযরত উমার রাঃ কে পাহাড়ার কাজে নিযুক্ত করলেন। এর মধ্যে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু সুফিয়ানকে নবীজীর কাছে নিয়ে আসে। এবং আবু সুফিয়ান বুঝতে পারে আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। এবং নবীজীর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নেন। মক্কায় প্রবেশের সময় মুহাজির এবং আনসারদের দ্বারা বেষ্টিত নবীজিকে দেখে আবু সুফিয়ান অবাক হয়ে যান। এই জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থা দেখে তিনি বলতে থাকেন এদের সাথে পারবে এমন কেউ নেই। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন এটাই নবুওয়াত। পদাতিক সৈন্যদের নেতৃত্বে ছিলেন আবু উবাইদা। রাসূল তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেন বাতেন ওয়াদির প্রান্তসীমা ধরে অগ্রসর হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। এরপর বিভিন্ন বাহিনী তাদের নির্ধারিত স্থানে চলে গেল। খালিদ বিন ওয়ালিদের পথে যেসব পৌত্তলিক এসেছিল তাদের সকলকে হত্যা করা হলো। হযরত খালিদের বন্ধু কুরয বিন জাবির ফাহরি রাঃ এবং খুনাইস বিন খালিদ বিন রবিয়া রাঃ এসময় শাহাদাত বরণ করলেন। এর কারণ ছিল, এই দুইজন সেনাবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করছিলেন। সেই অবস্থায় তাদের হত্যা করা হয়। খান্দামায় পৌঁছানোর পর খালিদ এবং তার সঙ্গীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে ১২ জন নিহত হয়। এরপর তারা পালিয়ে যায়। হামাস বিন কাইস মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ঠিক করে রেখেছিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজ গৃহে প্রবেশ করল এবং তার স্ত্রীকে বলল, ‘দরজা বন্ধ করে দাও’। তার স্ত্রী কথাটি শুনে বলল, ‘আপনার সেই বাগাড়ম্বর গেলো কোথায়?’ সে বলল, ‘হায়রে! তুমি যদি খান্দামায় যুদ্ধের অবস্থা দেখতে তবে

এমন কথা বলতে না। তোমাকে কি আর বলবো, সাফওয়ান আর ইকরিমা ছুটে পালালো। নাঙ্গা তলোয়ার দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করা হল। সেই তলোয়ার গলা এবং মাথা এমনভাবে কাটছিল যে, নিহতদের হৃদয়বিদারক চিৎকার এবং হেহাল্লা ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছিল না'।

মক্কা বিজয় ও রাসূল ﷺ এর হারামে প্রবেশ:

রাসূলুল্লাহ সাঃ তার সামনে ও পিছনে এবং ডানে ও বামে আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের পরিবেষ্টিত অবস্থায় অত্যন্ত জাঁকজমক অথচ বিনয়ের সাথে মসজিদুল হারামে আগমন করলেন। দিনটি ছিল ৮ ম হিজরীর ২০ রমযান। মসজিদুল হারামে আগমনের পর সর্বপ্রথম তিনি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করলেন। তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদ অতিক্রমকালে সর্বদা তিনি তাঁর লাঠি/ছড়ি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করছিলেন। ওই সময়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর হাতে একটি ধনুক ছিল। আল্লাহর ঘরের আশেপাশে ও ছাদের উপরে ৩৬০ টি মূর্তি ছিল। রাসূল সাঃ মূর্তিগুলোকে আঘাত করছিলেন। রাসূল সাঃ এর আঘাতে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে পড়ছিল। আঘাত করতে করতে তিনি বলছিলেন-

“সত্য এসেছে, বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় বাতিল বিলুপ্ত হবেই”।(সূরা ইসরা, ১৭:৮১)

কাবা ঘরের ভিতরে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সালাত আদায় এবং কুরাইশদের উদ্দেশ্যে ভাষণ:

রাসূল সাঃ ভিতর থেকে কাবা ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। উসামা ও বিলাল ভিতরেই ছিলেন। তিনি দরজার সামনের দেয়ালের অভিমুখী হন এবং দেয়াল থেকে মাত্র তিন হাত দূরত্বে থেমে যান।এই অবস্থায় রাসূল সাঃ এর বাম পাশে দুটি স্তম্ভ, ডান পাশে একটি এবং পিছনে তিনটি স্তম্ভ ছিল। ওই সময়ে কাবা ঘরে ছিল ছয়টি খাম্বা বা খুঁটি। এরপর সেখানে তিনি সালাত আদায় করেন। সালাত আদায় শেষে আল্লাহর ঘরের ভিতরের অংশ তিনি ঘুরে ফিরে দেখতে থাকেন এবং তাওহীদের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতে থাকেন। এরপর পুনরায় কাবা ঘরের দরজা খুলে দেন রাসূলুল্লাহ সাঃ কী করছেন তা প্রত্যক্ষ করার জন্য বিশাল সংখ্যক কুরাইশ কাবা ঘরের সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সময় দুহাতে দরজার দুই পাল্লা ধরে নিম্নভাগে

দণ্ডায়মান কুরাইশদের সম্বন্ধে রাসূল সাঃ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন-

"আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করে দেখিয়েছেন। তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং তিনি এককভাবে সমস্ত দলকে পরাজিত করেছেন। শুনে রাখ, আল্লাহর ঘরের চাবি সংরক্ষণ এবং হাজীদের পানি পান করানোর সম্মান ছাড়া সমস্ত সম্মান অথবা পূর্ণতা অথবা রক্ত প্রবাহিত করা আমার এই দুই পদতলে রইল। ভুলবশত হত্যা যা লাঠি দ্বারা করা হয়ে থাকে তা ইচ্ছেকৃত হত্যা অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার জন্য রক্তপাতের খেসারত দিতে হবে। অর্থাৎ একশত উট যার মধ্যে চল্লিশটি উট হতে হবে গর্ভবতী। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের যুগের অহংকার এবং পূর্বপুরুষদের গৌরব খতম করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ আদম এর সন্তান এবং তিনি ছিলেন মাটির তৈরি। সালাত এর সময় হলে তিনি বিল্লাল রাঃ কে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কাবার ছাদে উঠে আযান দেয়া শুরু করেন। পুরুষ ও নারীরা নবীজির কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ফিরে আসেন।

হুনাইন যুদ্ধ

মক্কায় মুসলমানদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপার জেনে হাওয়াজিন গোত্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করে এবং মুসলমানদেরকে মক্কা থেকে বের করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। মালিক বিন আওফ নাজরি তাদের এই ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব দেয়। রাসূল ﷺ তাদের এই ব্যাপারটি জেনে যান। ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা এবং তায়েফের মাঝামাঝি হুনাইন-উপত্যকায় পৌঁছান। সেখানে এই বিপুল পরিমাণ সৈন্যসহ মুসলমানরা হাওয়াজিন গোত্রের মুখোমুখি হয়।

যুদ্ধের শুরুতে হাওয়াজিন গোত্র মুসলমানদের প্রায় পরাজিত করে ফেলেছিল; কিন্তু আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাহসিকতা এবং যুদ্ধে অটল থাকার দরুন মুসলমানরা বিজয় লাভ করে।

মুসলমানরা হাওয়াজিন গোত্রকে মারাত্মকভাবে পরাজিত করে। এই যুদ্ধে মুসলমানরা প্রচুর পরিমাণ গনিমতোর সম্পদ পেতে সক্ষম হন। নববী যুগের অন্য কোনো যুদ্ধে এই পরিমাণ গনিমতের মাল মুসলমানদের অর্জিত হয়নি।

তায়েফের যুদ্ধ

হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের অধিকাংশ লোকজন মালিক ইবনে আওফের নেতৃত্বে তায়েফের দিকে গমন করে। রাসুল ﷺ হুনাইনের ব্যস্ততা থেকে অবকাশের পর অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে তায়েফের উদ্দেশ্যে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি. এর নেতৃত্বে ১০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এরপর তিনি স্বয়ং তায়েফ অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে লিয়াহ নামক স্থানে মালিক ইবনে আওফের একটি দুর্গ ছিল। রাসুল ﷺ তা ভেঙ্গে ফেলেন। তারপর সামনে অগ্রসর হয়ে তায়েফ অবরোধ করেন। অবরোধ ধীরে ধীরে দীর্ঘায়িত হচ্ছিল। এ অবরোধ চল্লিশ দিন অব্যাহত থাকে।

উভয় পক্ষ থেকে তীর ও প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপণ চলতে থাকে। প্রথমে মুসলিমগণ যখন অবরোধ করলেন, তখন শত্রুরা এত অধিক পরিমাণে তীর নিক্ষেপ করেছিল যে, যেন টিড্ডিরা আকাশে আঁধার ফেলে এগিয়ে আসছে। এতে ১২ জন মুসলিম শহীদ হন আর কিছু সংখ্যক আহত হন। তারপর সেখান থেকে শিবির সরিয়ে অন্য স্থানে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়। এ পরিস্থিতিতে রাসুল ﷺ তায়েফবাসীর উপর মিনজানীক দিয়ে গোলা নিক্ষেপ করেন। ফলে দেয়ালের কয়েকটি স্থানে ফাটলের সৃষ্টি হয়। তখন মুসলিমগণ কামানের ভেতরে প্রবেশ করে দুর্গের কাছে গিয়ে আগুন জ্বালানোর পরিকল্পনা করেন। কিন্তু শত্রুরা তাদের উপর লোহার উত্তপ্ত টুকরো নিক্ষেপ করতে থাকে। ফলে কিছু সংখ্যক মুসলিম সেখানে শহীদ হয়ে যান।

শত্রুদের বশে আনার জন্য রাসুল ﷺ তাদের আঙুর গাছগুলো কাটতে আদেশ দিলেন। অধিক সংখ্যক গাছ কেটে ফেললে তারা আত্মীয়তা ও আল্লাহর দোহাই দিয়ে আবেদন জানায়; এরপর রাসুল ﷺ তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন। অবরোধ চলাকালে ঘোষণা দেওয়া হয়, যে গোলাম দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসবে সে মুক্ত। তখন তাদের থেকে ২২ জনের মতো বের হয়ে আসে ও মুসলিমদের দলভুক্ত হন।

অবরোধ দীর্ঘ হচ্ছিল। দুর্গ পতনের কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিলো না। এদিকে মুসলমানদের উপর তীর ও গরম লোহার আঘাত আসতে থাকলো। তাছাড়া তারা এক বছরের জন্য দুর্গের মধ্যে খাদ্য মজুদ করে রেখেছিলো। রাসূল ﷺ নওফাল ইবনে মুআবিয়ার নিকট পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন, এখানে অটল থাকলে তাদেরকে ধরে ফেলতে পারবেন। আর যদি ছেড়ে চলে যান, তারা আপনার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। এ কথা শুনে আগামী দিন চলে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হলো। কিন্তু তিনি সাহাবাগণকে নাখোশ দেখে আগামীকালও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সাহাবাগণ তায়েফ বিজয় করা ছাড়া যেতে চাইলেন না। তার পরের দিন মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের জন্য গেলেও আঘাত নিয়ে ফিরে আসা ছাড়া কোনো সুবিধা করা গেলো না। এবার সকলে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যেতে প্রস্তুত হলেন। রাসূল ﷺ তখন মৃদু হাসতে থাকলেন।

এক মুঠো মাটির মুজেযা :
নবীজি জমিন থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে শত্রুপক্ষের দিকে নিক্ষেপ করেন। আল্লাহর কুদরতে এই মাটি প্রত্যেকের চোখে পৌঁছে যায়। এবং তারা পরাজিত হয়, ভয়ে পালিয়ে যায়।

তাবুক যুদ্ধ

নবম হিজরির মধ্যভাগ পর্যন্ত রাসুল ﷺ মদীনায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি সংবাদ পান, মুতা যুদ্ধে পরাজিত রোমানরা তাবুকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফলে নবীজিও জিহাদের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করেন। তখন দুর্ভিক্ষের কারণে মুসলমানরা অত্যন্ত নিঃস্ব ও দরিদ্র অবস্থায় ছিলেন। তাছাড়া ওই সময় ছিল তীব্র গরম। এরপরও ইসলামের জন্য প্রাণোৎসর্গকারী সাহাবীরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা তোলা হয়। আবু বকর রা. তাঁর বাড়ির সমস্ত জিনিস এনে দেন। উসমান রা. বিপুল পরিমাণ অনুদান দেন। যার মধ্যে ছিল ৯০০ উট ও ১০০ ঘোড়া। ৩ রজব মাসের বৃহস্পতিবার ৩০ হাজার সাহাবীর বাহিনী নিয়ে নবীজি তাবুকের উদ্দেশে রওনা হন। মুসলিম বাহিনী তাবুকে পৌঁছে দেখে সেখানে কেউ নেই।

হিরাক্লিয়াস ময়দান ছেড়ে চলে গিয়েছে। খালিদ বিন ওয়ালিদকে নবীজি খ্রিষ্টান নেতা উকাইদিরের কাছে পাঠান। এবং ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে বলে দেন তুমি রাতের বেলা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, যখন সে শিকারে ব্যস্ত থাকবে। খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. সেখানে গিয়ে তাকে ঐ অবস্থাতেই পায় এবং তাকে ধরে নবীজির কাছে নিয়ে আসে। মুসলিম বাহিনী সেখানে প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিন অপেক্ষা করে কিন্তু কেউ আসেনা। রমজান মাসে তারা মদিনায় ফিরে আসে।

মসজিদে যিরারে অগ্নিসংযোগ:

মদীনায় ফিরে আসার পর নবীজি ওই স্থান আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দেন, যেখানে বসে মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরামর্শ করত। মুসলমানদের ধোঁকা দিতে তারা এর নাম দিয়েছিল মসজিদ। বোঝা গেল, মসজিদে যিরার মূলত মসজিদ ছিল না।

প্রতিনিধিদলের আগমন এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ:-

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন রাস্তা নিরাপদ হয়ে যায়, তখন বিস্তৃত আকারে ইসলাম প্রচার-প্রসার লাভ করে। এজন্য আকাশের খাতায় এই সন্ধির নাম রাখা হয়েছে 'বিজয়'। এরপরও কিছু লোক কুরাইশদের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারছিল না। মক্কা বিজয়ের পর এই সমস্যাও কেটে যায়। তখন তারা ইসলাম এর ছায়ায় চলে আসে।

প্রতিনিধি দল সমূহ:-

১. সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি দল

২. বনু ফাজারার প্রতিনিধি দল

৩. বনু তামিমের প্রতিনিধি দল

৪. বনু সাদ বিন বকরের প্রতিনিধি দল

৫. কিন্দার প্রতিনিধি দল

৬. বনু আব্দে কায়েস এর দল

৭. বনু হানিফার প্রতিনিধি দল।

এরকম আরো বহু প্রতিনিধি দল নিয়মিত আসতে থাকে। যার সংখ্যা ৭০ টির মত।

বিদায় হজ

রাসূল ﷺ বুঝতে পারছিলেন যে দুনিয়ায় তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যে শিরকের অস্তিত্ব মুছে ফেলার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে পাঠিয়েছিলেন, তার প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত এই মিশন চালিয়ে যাওয়ার জন্য তার অনুসারীদের তিনি নির্দেশ দিয়ে যাবেন। আল্লাহ সুবহানু তায়ালা তার হাবিবকে দুনিয়ার বুক থেকে নিয়ে যাবেন।

জিলকদ মাসের চার দিন বাকি থাকতে ইবনে ইসহাকের মতে দিনটি ছিল ২৫ শে জুল কাদাহ, শনিবার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার দিকে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। তিনি চুলের তেল ব্যবহার করলেন, পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করলেন, কোরবানির পশুকে সুসজ্জিত করলেন এবং যোহরের সালাত আদায় করে রওনা হলেন।

যোহরের সালাতের পূর্বে রাসূল ﷺ গোসল করলেন। আয়েশা রা: রাসূলুল্লাহর ﷺ শরীরে এবং মাথায় নিজ হাতে মালিশ করে দিলেন। এরপর তিনি লুঙ্গি পরিধান করলেন, চাদর গায়ে দিলেন এবং যোহরের দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি একই সাথে ওমরা ও হজের তালবিয়া উচ্চারণ করলেন। বাইরে এসে উটের উপর আরোহণ করলেন। ফাঁকা ময়দানে এসে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করলেন। দিনটি ছিল দশম হিজরীর ৪ঠা জিলহজ রবিবার। মসজিদুল হারামে পৌঁছে আল্লাহর নবী সা: কাবাঘর তাওয়াফ করেন এরপর তিনি মাকামে ইব্রাহিমকে সামনে রেখে দুই রাকাত সালাত আদায় করেন এবং পুনরায় হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন।

৮ই জিলহজ রাসূল সাঃ মিনায় গেলেন। সেখানে ৯ই জিলহজ তারিখ সকাল পর্যন্ত অবস্থান করলেন। সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজরের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলেন। এরপর সূর্যোদয়ের পরে আরাফার দিকে রওনা হয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে নামিরা প্রান্তরে তাবু স্থাপন করলেন। সেখানেই সূর্যাস্তের পরে রাসূল সাঃ এর কাসওয়া নামক উটের পিঠে হাওদা চাপানো হলো। তিনি বাতনে ওয়াদিতে চলে গেলেন। ওই সময়ে রাসূল সাঃ এর সাথে ছিলেন ১,২৪,০০০ কিংবা ১,৪৪,০০০ জনতার ঢল।

বিদায় হজের ভাষণ:

এই বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে তিনি এক ঐতিহাসিক, মর্মস্পর্শী এবং কালজয়ী ভাষণ প্রদান করলেন। সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেনঃ

'লোকেরা, তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনো! হয়তো আজকের পর আমি আর কখনো এখানে তোমাদের সঙ্গে একত্রিত হতে পারবো না। আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহর যেমন পবিত্র; তোমাদের জান, মাল, ইজ্জত কিয়ামত পর্যন্ত তেমনই পবিত্র। কারো কাছে যদি কোনো আমানত রক্ষিত থাকে, তাহলে সে যেন তা আমানতকারীর কাছে পৌঁছে দেয়। তোমরা অন্যের ওপর অত্যাচার করবে না, নিজেরাও অত্যাচারিত হবে না।

জেনে রেখো, জাহিলী যুগের সকল অপসংস্কৃতি আমার পায়ের নিচে। শুধু কাবাঘরের তত্ত্বাবধান ও হাজীদের পানি পান করানো ছাড়া। জাহিলিয়াতের সকল রক্তপণ্যের দাবি বাতিল করা হলো। প্রথম যে রক্তপণ্যের দাবি বাতিল করছি, তা হলো রবিয়া ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিবের রক্ত। সে শিশু অবস্থায় বনু সাদের দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। জাহেলী যুগের সুদের প্রথা বিলুপ্ত করা হলো। তোমাদের কেবল মূলধনের ওপর অধিকার থাকলো। সর্বপ্রথম যে সুদ বাতিল করছি, তা হলো আমাদের বংশের আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল করা হলো। নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নারীদের উপর যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে, তেমনি পুরুষদের উপর রয়েছে নারীদের অধিকার। তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর নির্ধারিত কালিমা বাক্যের মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা অপছন্দ করো এমন কাউকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার কর।আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো, তোমরা তাদের ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছেদের ভার বহন করবে ন্যায়সঙ্গতভাবে।

আমার পর তোমরা পরস্পর খুনোখুনিতে জড়িয়ে কুফরে পতিত হয়ো না। যারা সালাত আদায় করবে, তারা (পুনরায়) শয়তানের ইবাদত করবে, এটা শয়তান আশা করে না। কিন্তু সে তোমাদের মধ্যে বিবাদ করতে থাকবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। যদি বিকলাঙ্গ কোনো দাসও তোমাদের উপর নেতা নিযুক্ত হয় এবং সে তোমাদের আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী নেতৃত্ব দেয়, তাহলে তাঁকে শুনবে ও মানবে। সাবধান! অপরাধী তাঁর

অপরাধের জন্য নিজেই দায়ী। সাবধান! পিতার অপরাধ সন্তানের ওপর বর্তায় না, না বর্তায় সন্তানের অপরাধ পিতার উপরে। জেনে রেখো, এ নগরে আর কখনো শয়তানের ইবাদত হবে না, এ থেকে সে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে তুচ্ছ ভেবে এমন অনেক কাজ তোমরা করবে, যা করলে সে খুশি হবে। তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, রমাদান মাসে সিয়াম পালন করবে, যাকাত আদায় করবে ও তোমাদের নেতার আদেশ মেনে চলবে, তবে তোমরা জান্নাত লাভ করবে। তোমাদের গোলাম ও অধীনস্থদের বিষয়ে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। তোমরা যা খাবে, তাদেরকে তা খেতে দেবে। তোমরা যা পরবে তাদেরকেও সেভাবে পরতে দেবে। জেনে রেখো, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। তোমাদের একের সম্পদ আরেকজনের জন্য বৈধ নয়। তবে কেউ স্বেচ্ছায়, খুশি মনে তার সম্পদ কাউকে দিয়ে দিলে সেটা ভিন্ন কথা। কাজেই নিজেরা নিজেদের ওপর জুলুম কোরো না। আল্লাহ তাআলা তোমাদের সম্পদের মিরাস নির্দিষ্টভাবে বণ্টন করে দিয়েছেন। তার থেকে কম বেশি করবে না। সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগের চেয়ে অতিরিক্ত কোনো অসিয়ত বৈধ নয়। সন্তান যার বিছানায় জন্ম গ্রহণ করবে, সে তারই হবে। ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে প্রস্তরাঘাত। (অর্থাৎ সন্তানের জন্য শর্ত হলো তা বিবাহিত দম্পতির হতে হবে। ব্যভিচারীর সন্তানের অধিকার নেই)। যে সন্তান আপন পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা এবং যে দাস নিজের মালিক ব্যতীত অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে, তাদের উপর আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতাকুল এবং সমগ্র মানব জাতির অভিশাপ। নিশ্চয়ই তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতা এক। আরবের ওপর অনারবের এবং অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সাদার উপর কালোর আর কালোর উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে কেবল তাকওয়ার মাপকাঠিতে। মনে রেখো, সকলকে একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হতে হবে। সে দিন তিনি প্রতিটি কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন। তোমরা আমার পরে গোমরাহিতে লিপ্ত হবে না, পরস্পর হানাহানিতে মেতে উঠবে না। আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। আমার মাধ্যমে ওহাহীর পরিসমাপ্তি হতে যাচ্ছে। আমি তোমাদের জন্য দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এই দুটি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব ও অপরটি রাসূলের সুন্নাহ। প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে আমার কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেয়। হতে পারে, যাদের

কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকবে যারা উপস্থিত শ্রোতার চাইতে আমার কথাগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবে।'

খুতবা শেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা তখন কী বলবে?

সাহাবিরা উত্তর দিলেন, 'আমরা সাক্ষ্য দেবো, নিশ্চয়ই আপনি আপনার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আমাদের আন্তরিক উপদেশ দিয়েছেন।" এরপর আল্লাহর রাসূল আকাশের দিকে আঙুল তুললেন, এরপর আবার মানুষের দিকে আঙুল দেখালেন, এরকম কয়েকবার করলেন আর বলতে থাকলেন,

'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো! হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো! হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো!'

আল্লাহর রাসূল সা: দু'আ:

বিদায় হজ্জের আলোচনার উপসংহার হিসেবে যোগ্য আল্লাহর রাসূলের এই দু'আটি। শাইখ আবুল হাসান আন-নাদভী তাঁর আস-সীরাহ আন-নববী গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন,

“হে আল্লাহ! তুমি নিশ্চয়ই আমার কথাগুলো শুনেছো, দেখেছো আমি কোথায় আছি। তুমি আমার অন্তরের খবর জানো, তুমি আমার বাহ্যিক অবস্থাও জানো, আমার কিছুই তোমার কাছে গোপন নয়। আমি অসহায়, দুর্বল। আমি তোমার কাছে সাহায্য চাই, তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমি তোমার শাস্তির আশঙ্কা করি, ভয় করি। আমি নিজের সমস্ত দোষ তোমার কাছে স্বীকার করে নিচ্ছি। এক অসহায় বান্দা হিসেবে আমি তোমার কাছে সাহায্য চাই, গুনাহগার হিসেবে আমি তোমার কাছে তাওবা করি। একজন ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ হয়ে আমি তোমার কাছে মিনতি করছি, নিজেকে সঁপে দিয়ে তোমার কাছে মিনতি করছি, অঝোরে কেঁদে তোমার কাছে মিনতি করছি, বিনম্র হয়ে তোমার কাছে মিনতি করছি। ও আল্লাহ! ও আমার রব! তুমি আমার এই মিনতি কবুল করে আমাকে সন্তুষ্ট করো। আমার প্রতি দয়া করো, করুণা করো! তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দুআ শ্রবণকারী, তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দাতা!”

সারিয়্যায়ে উসামা:
মক্কা থেকে ফিরে আসার পর একাদশ হিজরির ২৬ সফর সোমবার রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। এতে আবু বকর, উমর ও আবু উবাইদা রা.-এর মতো বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তবে এই সারিয়ার আমির নির্ধারণ করেন উসামা বিন যায়েদ রা.-কে। এটি ছিল নবীজি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত শেষ বাহিনী। এই বাহিনী রওনা হওয়ার আগেই নবীজি জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়েন।

রাসূলে কারীম ﷺ এর বিদায়

সূরা নাসরে আল্লাহর রাসূল সা: জীবনাবসানের ইঙ্গিত আছে। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস একজন তরুণ সাহাবি, কিন্তু তিনি বয়স্ক মুহাজির ও আনসারদের সাথে উমর ইবন খাত্তাবের দরবারে বসতেন। এত কমবয়স্ক একজন সাহাবির উপস্থিতিতে প্রবীণ মুহাজির এবং আনসাররা কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতেন, তারা একদিন বললেন, 'এই যুবক আমাদের সাথে কেন বসছে?' উমর তাদের প্রশ্নের জবাবটা একটু ঘুরিয়ে দিলেন, বললেন, 'আচ্ছা, সূরা নাসর থেকে আপনারা কে কী বোঝেন?' সবাই নিজ নিজ ব্যাখ্যা দিল। উমর এরপর ইবন আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এই সূরা থেকে কী বোঝো?' ইবন আব্বাস বললেন, 'আমি এই সূরা থেকে রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর ব্যাপারে ইঙ্গিত পাই।' উমর বললেন, 'আর আমিও তা-ই বুঝি।' এর মাধ্যমে উমর উপস্থিত সাহাবিদের বুঝিয়ে দিলেন যে, ইবন আব্বাসের বয়স কম হতে পারে, কিন্তু কুরআনের বিষয়ে তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে তিনি উমরের দরবারে অন্য প্রবীণ সাহাবিদের সাথে স্থান পেয়েছেন। সাধারণত কোনো কাজ শেষ করার পর আল্লাহ আযযা ওয়া জালের কাছে ইসতিগফার করা হয়। এই সূরায় আল্লাহ বলছেন, যখন আল্লাহর দ্বীনের বিজয় আসবে, মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহর রাসূল যেন ইসতিগফার করেন। এই ইসতিগফার তাঁর দাওয়াহ মিশনের সমাপ্তির দিকে ইঙ্গিত করে।

আল্লাহর রাসূলের মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করে এমন বেশ কিছু হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ মুআয ইবন জাবালকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বলেন, 'তোমার সাথে হয়তো আমার আর দেখা হবে না।' এ কথা শুনে মুআয কাঁদতে থাকেন। অন্য একটি হাদীসে

রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'আমার কাছ থেকে হজ্জের নিয়ম শিখে নিও, কেননা এই বারের পর হয়ত আমি আর কখনো হজ্জ করতে পারবো না।' আরও একটি হাদীস আছে সহীহ বুখারিতে, সেটি বর্ণনা করেছেন আইশা (রাঃ)। তিনি বলেন,একবার আমরা নবীজির সব স্ত্রী একসাথে বসে আছি, এমন সময় ফাতিমা পায়ে হেঁটে আসছিলেন। আল্লাহর কসম। তাঁর হাঁটা যেন অবিকল রাসূলুল্লাহর হাঁটার মতো ছিল। মেয়েকে দেখে নবীজি স্বাগত জানালেন, বললেন, 'আমার মেয়ের আগমন শুভ হোক।' তারপর তাঁকে নিজের পাশে বসালেন। এরপর ফাতিমাকে কানে-কানে কিছু একটা বললেন, আর ফাতিমা খুব করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর অস্থিরতা দেখে দ্বিতীয়বার তাঁর কানে-কানে কিছু একটা বললেন। তখন ফাতিমা হাসতে লাগলেন!

নবীজীর স্ত্রীদের মধ্য থেকে আমি বলে উঠলাম, আমাদের উপস্থিতিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ সবার মাঝে আলাদা করে তোমাকে গোপনে একটা কথা বলেছেন, আর তুমি কাঁদছো! এরপর যখন নবীজী উঠে চলে গেলেন, তখন আমি ফাতেমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আচ্ছা, উনি তোমাকে কানে-কানে কী বলেছিলেন? ফাতেমা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহর গোপন কথা ফাঁস করবো না। এরপর যখন রাসূলুল্লাহর মৃত্যু হলো, আমি তাঁকে বললাম, তোমার ওপর আমার দাবি থেকে জানতে চাই, তুমি কি আমাকে তাঁর গোপন কথাটি বলবে না? ফাতেমা বললেন, হ্যাঁ, এখন তোমাকে জানাবো। প্রথমবার তিনি আমাকে গোপনে বলেছিলেন, জিবরীল প্রতি বছর এসে পূর্ণ কুরআন একবার আমার নিকট পেশ করতেন। কিন্তু এ বছর তিনি এসে তা আমার কাছে দু'বার পেশ করেছেন। এতে আমি ধারণা করছি যে, আমার চির বিদায়ের সময় চলে এসেছে। সুতরাং তুমি আল্লাহকে ভয় করে চলবে আর বিপদে ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগামী। তখন আমি কাঁদতে থাকি, যা তুমি নিজেই দেখেছো। আর এরপর অস্থিরতা দেখে আমাকে দ্বিতীয়বার কানে-কানে বললেন, ফাতেমা, তুমি কি এটা পছন্দ করো না যে তুমি মু'মিন নারীদের সর্দার হবে অথবা এই উম্মতের নারীদের সর্দার হবে? তখন আমি হেসে দিলাম, সেটাও তুমি দেখেছো।'

সে বছর সফর মাসের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ একদিন মাঝরাতে আবু মুওয়াইহিবাকে ডেকে বললেন, 'আবু মুওয়াইহিবা, আমাকে বাকী'র অধিবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার আদেশ করা হয়েছে। চলো আমার সাথে।' আবু মুওয়াইহিবা ছিলেন আল্লাহর রাসূলের আযাদকৃত দাস। 'আল বাকী' হলো মদীনার কবরস্থান। সেখানে সমাহিত করা হয়েছে

সেই সব সাহাবিদের যারা রাসূলুল্লাহর সাথে কষ্ট করেছেন, যুদ্ধ করেছেন, ইসলামের জন্য জান দিয়েছেন। গভীর রাত। রাসূলুল্লাহ বাকীতে গেলেন,
'হে কবরবাসী, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা যে অবস্থায় আছো, সেটা জীবিতদের চাইতে ভালো। তোমরা সুখী হও। আঁধার রাতের মতো ধেয়ে আসছে ফিতনা-ফাসাদ- একটার পেছনে আরেকটা, আর প্রথমটার চাইতে পরেরটা ভয়াবহ।'
এরপর রাসূলুল্লাহ আবু মুওয়াইহিবার দিকে তাকালেন। বললেন, 'আমাকে এই দুই এর মাঝে একটি বাছাই করতে বলা হয়েছিল, হয় আমি দুনিয়ার সমস্ত রত্নভাণ্ডার আর সম্পদের চাবি নিয়ে শেষ পর্যন্ত থাকবো। এরপর জান্নাতে যাবো। অথবা আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ এবং জান্নাত।'
আবু মুওয়াইহিবা বললেন, 'আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরআন হোক। আপনি দুনিয়ার রত্নভাণ্ডার, শেষপর্যন্ত দুনিয়াতে থেকে তারপর জান্নাত সুযোগটাই বেছে নিন!'
রাসূলুল্লাহ বললেন, 'না, আল্লাহর কসম, আমি আমার রবের সাথে মিলিত হওয়া এবং জান্নাতকেই বেছে নিয়েছি।'
তিনি দুনিয়ার বাদশাহ ছিলেন কিন্তু তাঁর চাওয়া এবং পাওয়া দুনিয়া থেকে কিছুই ছিল না।তিনি এক অন্যরকম নেতা ছিলেন। যার কোনো অহমিকা ছিল না,কোনো চাহিদা ছিল না,ছিল না কোনো সহায় সম্পদ।আরাম আয়েশ বলতে তার জীবনের কিছুই ছিল না।

আবু বকর রা: ইমামতি:
রাসূল (সা.) অসুস্থ থাকাকালীন একবার নামাজের সময় হলে তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইমামতি করার নির্দেশ দেন। হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলকে বলেছিলেন যে, আবু বকর (রা.) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ, তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়ালে কেঁদে ফেলবেন এবং কিরাত পড়তে পারবেন না। কিন্তু রাসূল (সা.) তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং আবু বকর (রা.)-কেই নামাজ পড়াতে বলেন।
এক পর্যায়ে রাসূল (সা.) কিছুটা সুস্থ বোধ করলে দুইজনের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে আসেন। তখন আবু বকর (রা.) পেছনে সরে আসতে চাইলে রাসূল (সা.) তাঁকে ইশারায় নিজ স্থানে থাকতে বলেন এবং নিজে তাঁর পাশে বসে নামাজ আদায় করেন।

জীবনের শেষ সময়ে আল্লাহ্‌র নবী ﷺ:

সোমবার ফজর নামাজের সময় সাহাবীগণ যখন কাতারবদ্ধ ছিলেন, তখন রাসূল (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর কক্ষের পর্দা সরিয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন। তাঁর চেহারা ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। সাহাবীগণ খুশিতে নামাজ ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম হয়েছিলেন, কিন্তু রাসূল (সা.) ইশারায় তাঁদের নামাজ পূর্ণ করতে বলেন। এরপর তিনি পুনরায় কক্ষে ফিরে যান এবং পর্দা টেনে দেওয়া হয়।সাহাবীগণ নিজেদের কাজে ফিরে যান।

ধীরে ধীরে রাসুলের মৃত্যুযন্ত্রণা তীব্র হচ্ছিল। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে উসামা ইবনে জায়েদ প্রবেশ করেন। রাসুল তখন কথা বলতে পারছিলেন না; তবে হাত আকাশের দিকে উঁচু করে উসামার ওপর রাখেন, যেন তিনি তাঁর জন্য দোয়া করছেন। এরপর রাসুলের স্ত্রী সাইয়িদা আয়েশা রাসুল-কে তাঁর কোলে তুলে নেন। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর হাতে একটি মিসওয়াক নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলে রাসুল ﷺ সেদিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন। আয়েশা (রা.) বললেন, 'আমি কি আপনার জন্য তা নেব?' রাসুল ﷺ ইতিবাচক ইঙ্গিত করলে আয়েশা (রা.) ভাইয়ের হাত থেকে মিসওয়াক নিয়ে চিবিয়ে তা কিছুটা নরম করে রাসুলের হাতে দেন। রাসুল মিসওয়াক করেন। তা দিয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এতকিছুর মধ্যেও তাঁর মুখ থেকে বের হচ্ছিল الرفيق الأعلى বা প্রিয় বন্ধুর সান্নিধ্যে। তাঁর পাশে রাখা একটি পানির পাত্রে বারবার হাত প্রবেশ করাচ্ছিলেন এবং সেখান থেকে পানি নিয়ে নিজের মুখমণ্ডল মাসেহ করছিলেন আর বলছিলেন, "আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয় প্রতিটি মৃত্যুতেই যন্ত্রণা রয়েছে।"

এরপর তিনি হাত উপরের দিকে তুলে বলতে থাকেন, في الرفيق الأعلى আর এই অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। হাত এক দিকে ঝুঁলে পড়ে। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসুল তখনো বলছিলেন,

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

(হে আল্লাহ, আমাকে মৃত্যুযন্ত্রণায় সহযোগিতা করুন।)

অন্য বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসুলের মৃত্যুপূর্ব সময়ে তাঁর মুখের কাছে ঝুঁকেছিলাম। তিনি তখন বলছিলেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى

(হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন এবং আমাকে মহান বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন।)

এক বর্ণনায় আছে, রাসুলের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে ফাতিমা (রা.) বলছিলেন, 'আহ! আমার পিতার কষ্ট!' রাসুল ﷺ তাঁকে বলেন, 'তোমার পিতার আজকের দিনের পর আর কোনো কষ্ট হবে না।' রাসুলের ইন্তেকালের পর ফাতিমা (রা.) বলেন, 'হে আমার পিতা, আপনি আপনার প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। হে আমার পিতা, যাঁর বাসস্থান হবে জান্নাতুল ফিরদাউস। হে আমার পিতা, আমরা জিবরিলের মাধ্যমে আপনার শোকগাথা পেশ করব।'

রাসূল-কে যখন দাফন করা হয়, তখন তাঁর কন্যা ফাতিমা রা. বলেন, 'হে মানুষজন, তোমাদের আত্মা কীভাবে সংবরণ করছে যে, তোমরা আল্লাহর রাসূলের উপর মাটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছ?

দুনিয়ার বাদশাহ বিদায় নিলেন। সহিহ বুখারী অনুযায়ী তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর।

উমর রা: এর অবস্থা:

রাসূল ﷺ এর মৃত্যু সংবাদ শোনার সাথে সাথে উমর রা. এর হুশ বুদ্ধি লোপ পেতে থাকে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেন, কিছু সংখ্যক মুনাফিক মনে করেছে যে, রাসূলুল্লাহ সা: মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি, বরং আপন প্রতিপালকের নিকট গমন করেছেন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সা: ও অবশ্যই ফিরে আসবেন এবং ঐ সকল লোকের হাত পা কেটে দেবেন যারা মনে করে যে প্রকৃতই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

আবু বকর রা: এর সিদ্ধান্ত:

রাসূলের ইনতিকালের সংবাদ যখন আবু বকর রা.-এর গোচরীভূত হয়, তিনি তাৎক্ষণিক ঘোড়ায় আরোহন করে সুনাহ থেকে ফিরে আসেন। মসজিদে নববির সামনে অবতরণ করে কারও সঙ্গে কথা না বলে আয়েশা সিদ্দিকার কক্ষের দিকে এগিয়ে যান। কক্ষে প্রবেশ করে রাসূলের চেহারা কাপড় দিয়ে আবৃত করে রাখা অবস্থায় দেখতে পান।

তিনি রাসূলের চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে একটু ঝুঁকে গিয়ে মুখে চুমু খান এবং কেঁদে ওঠেন। এরপর বলেন, 'আল্লাহর রাসূল, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক! নিশ্চয় আল্লাহ আপনার জন্য দুটি মৃত্যু একত্র করবেন না। আপনার জন্য যে মৃত্যু নির্ধারিত ছিল, আপনি তা বরণ করেছেন।'

আবু বকর রা. বেরিয়ে উমর রা.-এর সঙ্গে কথা বলেন। বলেন, 'উমর, তুমি বসে যাও।' উমর রা: তখনো রাগান্বিত অবস্থায় নিজের কথা বলে যাচ্ছিলেন। তখন আবু বকর রা. মানুষের সামনে বক্তব্য দিতে দাঁড়িয়ে যান। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর বলেন, 'নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে মুহাম্মাদের ইবাদত করত, সে যেন এ কথা জেনে নেয় যে, মুহাম্মাদ ইনতিকাল করেছেন। আর যে আল্লাহর ইবাদত করত, সে যেন এ কথা স্মরণ রাখে, নিশ্চয় আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো ইনতিকাল করবেন না।' এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন।

আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়েছেন। তাহলে তিনি যদি মারা যান; অথবা নিহত হন, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে? বস্তুত কেউ যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না; আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সাওয়াব দান করবেন। [সূরা আলে ইমরান: ১৪৪]

উমর রা. বলেন, আল্লাহর শপথ, যখন আবু বকর রা. এই আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন, আমি স্থির থাকতে পারছিলাম না। আমার পা আমার শরীরের ভার বহন করতে পারছিল না। আমি এ আয়াত শোনার সাথেই তাৎক্ষণিক মাটিতে বসে পড়ি। তখন মনে হচ্ছিল সত্যিই রাসূল ﷺ ইনতিকাল করেছেন।

খলিফা নির্বাচন ও কাফন-দাফন:

রাসূলের কাফন দাফনের পূর্বে রাসূলের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো। সাকীফা বনু সাঈদায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আবু বকর রাঃ এর খিলাফতের ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হল এবং রাত চলে আসলো। এই অবস্থায় সোমবার দিবাগত রাত অতিবাহিত হলো, মঙ্গলবার সকাল চলে আসলো। এই সময় পর্যন্ত রাসূলের দেহ একটি চাদরে আবৃত অবস্থায় ছিল। ঘরের মানুষেরা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ রেখেছিল। মঙ্গলবার দিন রাসূলকে কাপড়সহ গোসল দেয়া হলো। গোসল দেওয়ার কাজে অংশ নিলেন হযরত আব্বাস, হযরত আলী, হযরত আব্বাসের দুই পুত্র ফযল ও কুসাম এবং রাসূলের আযাদকৃত দাস শুকরান, হযরত উসামা বিন যায়েদ ও আওস ইবনে খাওলা রাঃ। হযরত আব্বাস ও তাঁর দুই পুত্র রাসূলের পাশ পরিবর্তন করে দিচ্ছিলেন। হযরত উসামা ও হযরত শুকরান পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন এবং হযরত

আলী রাঃ রাসূল সাঃ কে গোসল করিয়ে দিচ্ছিলেন। রাসূলের দেহ মোবারককে নিজ বুকের উপর ভর করে নিয়ে রেখেছিলেন হযরত আউস রাঃ।

রাসূলকে তিনবার বরইপাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দেয়া হয়। কুবায়ে অবস্থিত সাদ বিন খায়সামা রাঃ এর 'গারস' নামক কূপের পানি দিয়ে গোসল দেওয়া হয়। রাসূল সাঃ এই কূপের পানি পান করতেন। গোসলের পর তিনটি সাদা চাদর দিয়ে রাসূলের কাফনের ব্যবস্থা করা হয়। এসবের মধ্যে জামা কিংবা পাগড়ি ছিল না। রাসূলের অন্তিম শয্যার স্থান সম্পর্কে সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ চাচ্ছিলেন তাঁকে মিম্বারের কাছে দাফন করতে, কেউ কেউ চাচ্ছিলেন জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে দাফন করতে আবার কেউ চাচ্ছিলেন তাঁর সালাতের স্থানে দাফন করতে। তখন আবু বকর রাঃ বললেন, "আমি রাসূল সাঃ কে বলতে শুনেছি, এমন কোনো নবীকে পৃথিবী থেকে উঠানো হয়নি যাকে সেই স্থানে দাফন করা হয়নি যেখানে তার মৃত্যু হয়েছে।" এরপর আবু তালহা রাঃ রাসূলের বিছানা উঠিয়ে নিলেন। যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে সেই বিছানার নিচে কবর খনন করা হলো।

সাহাবীগণ পালাক্রমে দশজন দশজন করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে জানাযার সালাত আদায় করলেন। নির্ধারিত কোনো ইমামের ব্যবস্থা ছিলনা। সর্বপ্রথম রাসূলের পরিবারের লোকেরা জানাযার সালাত আদায় করল। এরপর ক্রমান্বয়ে মুহাজির, এরপর আনসারগণ জানাযার সালাত আদায় করলেন। এরপর ক্রমান্বয়ে অন্য পুরুষ, মহিলা, শিশু ও দাসগণ জানাযার সালাত আদায় করলেন। মঙ্গলবার দিন পুরোটাই অতিবাহিত হয়ে যায় জানাযার সালাত আদায়ে। মঙ্গলবার দিন অতিবাহিত হওয়ার পর বুধবার রাতের মাঝামাঝি রাসূল সাঃ এর দেহ মোবারক কবরস্থ করা হয়। রাসূল সাঃ এর দাফনের সময় ফাতিমা রাঃ আবেগপ্লুত হয়ে আরও বলেন, "হে মানুষেরা! তোমাদের আত্মা কীভাবে স্থির আছে যখন তোমরা আল্লাহর রাসূলের উপর মাটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছ"? (সহীহ বুখারি)

কনোস ইবনে মালিক রাঃ বলেন, “আমরা আল্লাহর রাসূল সাঃ কে দাফন করতে নিজেরা স্বশরীরে অংশ নিয়েছিলাম। রাসূল সাঃ কে দাফন করে আমরা তখনও হাত মুছিনি কিন্তু আমরা আমাদের অন্তরে পরিবর্তন অনুভব করছিলাম”।

রাসূল ﷺ এর পরিবার

উম্মুল মুমিনীনগণ :

রাসূল ﷺ এর মোট ১১ জন স্ত্রী ছিলেন। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ৯ জনের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

১. খাদিজা বিনতে খুওয়ায়লিদ রা. :

আল্লাহ্ আনহুর জীবদ্দশায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কাউকে বিবাহ করেননি। হিজরতের তিন বছর আগে তার মৃত্যু হয়। তখন নবীজির বয়স ছিল ৪৯ বছর।

২. আয়িশা বিনতে আবি বকর রা. :

আবু বকর রা.-এর কন্যা। ছয় বছর বয়সে নবীজির সঙ্গে তার বিয়ে হয়। প্রথম হিজরীতে ৯ বছর বয়সে তাকে নবীজির সংসারে নিয়ে আসে। নয় বছরের সংসারে কি অর্জন ছিল তা সাহাবীদের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত। তারা বলতেন আমাদের কোনো সন্দেহ হলে আমরা আয়েশার কাছে সেটা জেনে নিতাম। তিনি ৫৮ হিজরীতে ৬৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

৩. হাফসা বিনতে উমার রা. :

তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা ছিলেন। প্রথমে খুনাইস বিন হুজাফার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। হিজরতের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছরের নবীজির সঙ্গে বিবাহ হয়। তিনি ৪৫ হিজরীতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

৪. সাওদা বিনতে জাম'আ রা. :

তিনি সাকরান বিন আমরের স্ত্রী ছিলেন। তারপর নবীজির সাথে তার বিয়ে হয়।

৫. যায়নাব বিনতে জাহশ রা. :

তিনি নবীজির ফুফাতো বোন ছিলেন। নবীজি তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন জায়েদ বিন হারেসার সাথে। জায়েদ এক সময় তার গোলাম ছিল। কিন্তু এই বিয়ে টেকেনি। নবীজি অনেক বুঝানোর পরও তাদের তালাক হয়ে যায়। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে যায়নাব রা.-কে নবীজি বিয়ে করেন। জাহিলি যুগে আরবরা পালক পুত্রকে নিজের পুত্র মনে করতেন। জাহেলী যুগের এই প্রথা আল্লাহর নির্দেশে সেই সময়ই বন্ধ হয়। যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৬. যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রা.):

তিনি ‘উম্মুল মাসাকিন’ (মিসকিনদের মাতা) উপাধিতে পরিচিত। এর আগে তিনি তোফায়েল বিন হারিসের স্ত্রী ছিলেন। তালাক হওয়ার পর তাঁর ভাই উবাইদার সঙ্গে বিয়ে হয় এবং উবাইদা বদর যুদ্ধে শহীদ হন। এরপর ৩য় হিজরীতে উহুদ যুদ্ধের এক মাস আগে নবীজির সাথে তাঁর বিয়ে হয়। মাত্র দুই মাস পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

৭. উম্মে সালামা (রা.):

তাঁর নাম ছিল হিন্দ। প্রথমে আবু সালামার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। আবু সালামার মৃত্যুর পর নবীজির সাথে ৪র্থ হিজরীতে (ভিন্নমতে ৩য় হিজরীতে) তাঁর বিয়ে হয়। তিনি ৫৯ বা ৬২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। বলা হয়ে থাকে যে, উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যে সবার শেষে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৮. উম্মে হাবীবা বিনতে আবি সুফিয়ান (রা.):

তিনি আবু সুফিয়ানের কন্যা ছিলেন। ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল এবং তাঁদের সন্তানও ছিল। কিন্তু হাবশায় হিজরতের পর ওবায়দুল্লাহ ধর্ম ত্যাগ করে। উম্মে হাবীবা ঈমানের ওপর স্থির থাকেন; তখন হাবশার বাদশা নাজাশির কাছে চিঠি দিয়ে নবীজি তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং তাঁদের বিয়ে হয়।

৯. মায়মুনা বিনতে আল হারিস (রা.):

তিনি মাসুদ বিন ওমরের স্ত্রী ছিলেন। তালাকের পর আবু রুহেমের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর নবীজির সাথে বিয়ে হয়।

১০. জুওয়াইরিয়া বিনতে আল হারিস (রা.):

তিনি বনু মুস্তালিক গোত্রের সরদার হারিসের কন্যা ছিলেন। যুদ্ধবন্দী হিসেবে তাঁকে আনা হয়, এরপর ৬ষ্ঠ হিজরীতে নবীজির সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর বিয়ের উসিলায় তাঁর গোত্রের সবাইকে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং তাঁর পিতা ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ৫০ বা ৫৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১১. সাফিয়্যাহ বিনতে হুওয়াই (রা.):

তিনি হারুন (আ.)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তিনি এক নবীর বংশধর এবং আরেক নবীর পত্নী। তিনি কিনানা বিন আবুল হুকাইকের স্ত্রী ছিলেন। খায়বার যুদ্ধে স্বামী নিহত হওয়ার পর তিনি নবীজির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ৫০ বা ৫২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

উম্মুল মুমিনুল রা: এর সাথে যেমন ছিলেন তিনি:

তাদের সাথে নবীজীর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধু ও শ্রদ্ধা পূর্ণ। অত্যন্ত দরিদ্রতার মাঝে থেকেও তারা কখনো অভিযোগ করেননি। মহানবীর প্রতিটি বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন স্ত্রী দেরকে যথেষ্ট পরিমাণ সময় দিতেন। প্রতিদিন সকালে তিনি সবার কাছে একে একে গিয়ে সালাম দিতেন ও দোয়া করতেন। আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময় তিনি স্ত্রী ও পরিবারের জন্য বরাদ্দ রাখতেন। তিনি এক দিকে তাদের সাথে মজা করতেন অন্যদিকে তাদেরকে দিনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দিতেন। তিনি অনেক বেশি স্ত্রীদের প্রশংসা করতেন এবং সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করতেন খাদিজা রা: এর। আনাস থেকে বর্ণিত, "যখনই আল্লাহর রাসূল কোন উপহার পেতেন, তিনি বলতেন, 'এটি অমুকের কাছে নিয়ে যাও, কেননা সে খাদিজার বান্ধবী। এর কিছু অমুকের বাসায় নিয়ে যাও, কারণ সে খাদিজাকে ভালোবাসে'।" (আদাবুল মুফরাদ)

আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত, একবার খাদিজার বোন হালা বিনতে খুওয়াইলিদ আল্লাহর রাসূলের ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। তার গলার স্বর খাদিজার কণ্ঠের অনুরূপ ছিল। এতে রাসূলের খাদিজার কথা মনে পড়ল। তিনি খুশিতে বলে উঠলেন, "হে আল্লাহ! এটা যেন হালা হয়"। আমি ঈর্ষা অনুভব করলাম। বললাম, "আপনি কুরাইশের সে বৃদ্ধা মহিলার কথা এখনও বলেন যার কিনা দাঁত পড়ে গিয়েছিল অনেক আগে যে কিনা মারা গিয়েছে আর আল্লাহ আপনাদের উত্তম আরেকজন দিয়ে তাকে প্রতিস্থাপন করেছেন"। তার মুখের অভিব্যক্তি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠল যে আমি তারমধ্যে কেবল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে দেখতে পেতাম (পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মত আজাবের ভয়ে কিংবা তার ওপর যখন ওহী আসতো)। তিনি বললেন, "আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে উত্তম কাউকে দিয়ে প্রতিস্থাপন করেননি। সে আমার উপর বিশ্বাস করেছিল যখন লোকেরা অবিশ্বাস করত, সে আমাকে তার সম্পত্তি শক্তি যুগিয়েছিল যখন লোকের আমাকে পরিত্যাগ করেছিল, তার মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে সন্তান দিয়েছেন"। একথা শুনে আয়িশা তাকে বললেন, "যিনি আপনাকে সত্য বাণীসহ পাঠিয়েছেন আমি তার কসম করে বলছি, আজকের পর আমি তার প্রশংসা ছাড়া আর কোন কথা বলব না"। (আহমাদ, তাবারানি)

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

সীরাহ - রেইনড্রপস মিডিয়া।

উসওয়াতুন হাসানাহ-মুফতি তারেকুজ্জমান।

সীরাতে ইবনে হিশাম- ইবনে হিশাম।

ইসলামের ইতিহাস - কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক।

নবিয়ে রহমত- সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভি।

সীরাতে ইবনে কাসীর- আল্লামা ইবনে কাসীর রহি.।

সিরাতুন নবী - ড. আলী মোহাম্মদ সাল্লাবি।

আর রাহীকুল মাখতূম - আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী।

আই ও এম কর্তৃক পাঠ্য রিসোর্স সমূহ।